প্রথম প্রকাশ : ২৩ জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশিকা

বনশ্রী (ঝর্ণা) বক্সী

বুক ব্যাঙ্ক

অবধায়ক : রূপাঞ্জলি প্রকাশন সংস্থা

১২, গড়ফা রোড, হালতু, ২৪ পরগণা

মুদ্রণ

অধুনা প্রেস

১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

বহুশ্রুত বক্সী

আমার কথা

এই বইটি লেখার পরিকল্পনা আমার মাথায় ঢুকেছিল আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে। শেষ পর্যন্ত বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী। কিন্তু মাত্র কয়েকটি নমুনা বই ছাড়া আর সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তদানীন্তন দাঙ্গায় দপ্তরীর বাড়ী থেকে। আমার কাছে যে কটি বই ছিল তা আর অনর্থক বাজারে ছাড়া হয় না, ব্যক্তিগত স্মৃতি চিহ্ন হিসেবেই থেকে যায়। কিন্তু তাও অবাঙালী গুণ্ডারা যখন ১৯৭২ সালে আমার নৈহাটি গভর্ণমেণ্ট কোয়াটারের আবাস থেকে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তখন নিয়ে যায় (এই বিষয়ে নৈহাটি পুলিশ স্টেশনে যে মামলা রুজু হয় তা কেশ নং ২৬/২৬.১১.৭২)। তাই এই বইটি পাঠক চক্ষুর অগোচরেই থেকে গেছে। পরপব অন্যান্য নতুন বই লেখার ব্যস্ততায় এই বইটি দ্বিতীয়বার ফিরে লেখা ও প্রকাশ কবাব অবকাশও মেলেনি, উৎসাহও তেমন জোর করে পাই নি। তবে সম্প্রতি আমার জনৈক শুভানুধ্যায়ী সে বইয়ের একটি অসম্পূর্ণ কপি আমায় সংগ্রহ করে দেওয়ায় দ্বিতীয়বার বইটি মুদ্রণ করা সম্ভব হল। দ্বিতীয় মুদ্রণের শুরুতেই আমি গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মুদ্রণের কাজ ব্যাহত হতে চলেছিল। কিন্তু সে সমস্যা থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে শ্রীমান বাঘা দত্ত। জানিনা এ বই পাঠকসাধারণের চিত্তজয়ে সক্ষম হবে কিনা। আমি এ বইয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে আপোষ বিরোধী নেতা শৌর্যবান সুভাষচন্দ্রের রাজত্ব শুরু হলে কি পরিণতি হত তা কল্পনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কাল্পনিক গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক যদি পাঠকবৃন্দের চিত্তজয়ে সক্ষম হয় তবে এ বইটিও তাঁদের ভাল না লাগবার কথা নয়। অবশ্য ভাল লাগা বা না লাগার দায়িত্ব পাঠকবৃন্দের হাতে ছেড়ে দিয়েই আমি আমার কথা শেষ করছি।

শ্রীসুধাজিৎ

SUBHASHRAJ

By

SREE YUDHAJIT

Bahusruta Baksi

ঃ লেখকের অন্যান্য বই ঃ

অনুরাধা	(উপন্যাস)
রাগ-বিরাগ	ঐ
প্রতিভাসিতা	ঐ
কুমারী	ঐ
ভালবাসা	ঐ
বসন্তে বন্দিনী	ঐ
মেখলা পরা মেয়ে-১ম পর্ব	ঐ
মেখলা পরা মেয়ে-২য় পর্ব	ঐ
দেশের ডাক	(ভারত সরকার পুরস্কৃত নাটক)
নক্সালবাড়ী	(উপন্যাস)
খাদ্যমন্ত্রী-১ম পর্ব	ঐ
খাদ্যমন্ত্রী-২য় পর্ব	ঐ
দেশ-নেতা-জনতা	ঐ
স্বর্গে শ্যামাপ্রসাদ—শের-এ-বঙ্গাল— সারওয়ার্দি—শরৎ বসু	(নাটক)
পূর্ববঙ্গের মন্ত্রী পতন	(প্রবন্ধ)

(১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাজেয়াপ্ত)

শ্রীযুধাজিৎ লিখিত স্বাধীন ভারতে প্রথম বাজেয়াপ্ত বাংলা উপন্যাস 'মেখলা পরা মেয়ে' সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় অধ্যক্ষ দেবজ্যোতি বর্মণ লিখিত 'দৈনিক বসুমতী'-র প্রথম সম্পাদকীয় :

বাজেয়াপ্ত বই

সংবিধানে ভারতের সর্বত্র বাক্য ও রচনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করিয়া যে কোন লোক যে কোন বিষয় আলোচনা অথবা যে কোন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক ঘটনাবলী নিজস্ব দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ গণতান্ত্রিক সমাজে একটি বড় রকমের অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি আসাম গভর্ণমেণ্ট "মেখলা পরা মেয়ে" নামে একটি বই (১ম পর্ব) বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সংবাদটি আসাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গেজেটের ঐ বিজ্ঞপ্তি দেখিলে যে কোন স্বাধীনচিত্ত মানুষ বিস্মিত হইবেন। বইটি হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে ইহাতে আসামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব বইখানি আপত্তিকর বিবেচনা করিয়া উহা বাজেয়াপ্ত করা হইল। শুনিলাম এবার যত্রতত্র বইখানির সন্ধানের নামে পুলিশ বাড়ী তল্লাস শুরু করিয়াছে এবং বাঙালীদের উপরেই তাহাদের নজর বেশী পরিমাণে পড়িয়াছে।

বইটি আমরা দেখিয়াছি। উহার লেখক নিজের নাম দেন নাই। শ্রীযুধাজিৎ নামে বইটি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৬০ সালে আসাম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বইটি লিখিত হইয়াছে। উহাতে আসামের তৎকালীন ঘটনাবলী সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে গ্রন্থকার প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর প্রতি স্বগতোক্তি করিয়া বইটিতে একটি অভিনবত্বের সূচনাও করিয়াছেন।

আসামের ঘটনায় আসামী গুণ্ডাদের বর্ব্বরতা যেমন লেখক চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি অপর দিকে আসামী সমাজেও মানুষ আছে ইহা

দেখাইয়াছেন। বইটির নায়িকা আসামী। এই নায়িকার চরিত্র অতি মহৎ রূপে লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন। যে কোন দেশের যে কোন জাতি নিজেদের মধ্যে এরূপ কোনও এক তরুণী থাকিলে ধন্য মনে করিবে। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, আসাম সরকার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন এবং বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, অতি সাধারণ রসবোধটুকুও তাঁহাদের লোপ পাইয়া গিয়াছে। আসামী গুণ্ডাদের যে চরিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহা যে কোন দেশের যে কোন জাতিতে পাওয়া যাইবে। আসাম সরকার ইহাদিগকেই যদি আসামী জনসাধারণের প্রকৃত চিত্র বলিয়া মনে করেন এবং কোন জাতির গুণ্ডা চরিত্র থাকিলেই যদি তাহাকে সমগ্র জাতির চরিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবশ্য তাঁহাদিগকে সভ্য গভর্ণমেণ্ট বলিয়া গণ্য করিতে যে কেহ দ্বিধাবোধ করিবে।

আইনের দিক দিয়া বইটির বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতিতেও আপত্তির কারণ রহিয়াছে। কোন লেখা মানহানিজনক বা আপত্তিকর কিনা বিচার করিবার সময় সমগ্র লেখাটি বিবেচনা করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত বিচার পদ্ধতি। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের ও ভারতের আদালতে ভুরি ভুরি নজির রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনে 'লেডী চ্যাটার্লির প্রেম' বইটি লইয়াও এই নীতিই সমর্থিত হইয়াছে। কোন বইয়ের একটি চরিত্রের জন্য উহা বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' বইটি 'আয়গো' চরিত্রের জন্য বহু পূর্বেই বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল।

আসাম সরকার এই বইটি বাজেয়াপ্ত করিয়া পুস্তক অথবা রচনা বিচারের মূলনীতি উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই কাজে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

আসাম সরকারের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ বাংলা দেশে কেন হইল না, আমরা তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

'মেখলা পরা মেয়ে' বাজেয়াপ্ত করার দলিল

ASSAM GAZETTE August 2—1961

NO-PLA. 15/60/Pt. VIII/2.—Whereas the Governor of Assam is satisfied that the Book entitled "**Mekhla Para Meye**" written by one **Sri Judhajit**..........................as a whole and the following passages in particular, contain matters which promote or are intended to promote feeling of enmity and/or hatred between different classes of the citizens of India, namely Bengalees aud Assamese, viz.

Page		beginning from		and ending in
Page 44 (last para)		from এক সময় ও		in বীভৎস দৃশ্য
,, 46 (second para)	,,	সে স্বপ্ন ...	,,	বেড়াতে দেখে
,, 60 ,,	,,	১৪৪ ধারা ...	,,	ডুবে আছে
,, 76-79 (inclusive)	,,	হঠাৎ এক প্রচণ্ড ...	,,	তারা বাঙালী নয়
,, 82-86 ,,	,,	গাড়ী থামতে না থামতেই	,,	সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরল
,, 110 ,,	,,	তুমি বলো কানাই দা	,,	আমিই সেরে নেব
,, 177 ,,	,,	শিবানীর ভয় ব্যাকুল	,,	লোকগুলো উঠে যায়
,, 195-199 (inclusive)	,,	শুভেন্দুকে নিয়ে	,,	গ্রহণ ক'রে থাকে

AND

Whereas the passages on paragraph 2 of page 38 which begins form গৌহাটি সহরের অবস্থা and ends in পাপ ঢুকেছে and the last paragraph of page 198 which begins from এখন চলো and ends in গ্রহণ ক'রে থাকে also contain matters which promote or are intended to promote feeling of enmity and/or hatred between the Bengalees and Assamese Police Officers as a class : and whereas page 84 of the said Book particularly its last paragraph which begins from আমাদের এক শ্রেণীর and ends in শিখে দিতে হবে contains matters which promote or are intended to promote feeling of enmity and/or hatred between the Bengalee Hindus and Immigrant Muslims living in Assam :

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 99A of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act, V of 1898), the Governor of Assam is pleased to declare every copy of the said Book to be forfeited to the Government.

Sd/-A. N. Kidwai

Chief Secretary to the Govt. of Assam

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যপ্রকাশ সেনের লেখার ঘর। ঘরটার বৈশিষ্ট্য প্রচুর পুস্তক, প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী, নানা দৈনিক ও সাময়িক পত্রের স্তূপ প্রভৃতির সমাবেশে। বিরাট ঘরটার দেয়ালগুলি আছাদ উঁচু উঁচু আলমারিতে ঠাসা। আলমারিগুলি আকণ্ঠপূর্ণ নানা তথ্যে ভরা রেফারেন্স বইতে। এখানে ওখানে ছোট ছোট টিপয়গুলোতে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশী বিদেশী নানান সংবাদপত্রের কাটিংয়ের সমাবেশ।

সারা ঘরে নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপতা। দেয়ালে টাঙ্গানো ওয়াল ক্লকটার পেণ্ডুলাম টক্-টক্-টক্-টক্ শব্দে সঞ্চরণশীল। পেণ্ডুলামের সেই শব্দ নিঃশব্দতার নিশ্চুপতার মধ্যে যেন বড় বেমানান।

সত্যপ্রকাশের মাথার চুলে পাক ধরেছে। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। মুখে-চোখে বিরল ব্যক্তিত্বের ছাপ। যাকে বলা যায় জ্ঞান-বার্ধক্য। চোখে মোটা লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। চশমাটা নাকের উপর বেশ কিছুটা ঝুলে পড়েছে।

সময় সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। কিছুক্ষণ আগেই তাঁর কয়েকজন অধ্যাপক ছাত্র চলে গেছেন। সকালের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রবাসে সোভিয়েৎ রাশিয়ার তাসখন্দে মৃত্যু সংবাদ। এই মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক এ নিয়ে ডক্টর সত্যপ্রকাশের শিষ্যদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। সে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দু'পক্ষে চলেছে চুল-চেরা বিচার—

বিশ্লেষণ। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে যখন জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন তাঁর সঙ্গের ভারতীয় ডাক্তার ঘরে ঢুকলে তিনি জলের কুঁজোর দিকে কি কারণে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—এ নিয়ে দু'পক্ষে অনেকক্ষণ ধরে চলে তর্ক-বিতর্ক। এ মৃত্যু স্বাভাবিক যাঁরা বলতে চান এবং যাঁরা বলতে চান অস্বাভাবিক উভয়েই স্ব স্ব সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রায় তর্ক করতে করতেই ডক্টর সত্যপ্রকাশের ধমক খেয়ে প্রস্থান করেছেন যে যার গৃহাভিমুখে।

শিষ্য তথা একদার ছাত্ররা চলে গেলে সত্যপ্রকাশের মানস-লোকও সংশয়ের কুজ্‌ঝটিকায় যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে। ভাল মানুষ অ-বিকল দেহ-যন্ত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করতে পাড়ি জমালেন সোভিয়েৎ রাশিয়ায়—আর ফিরে আসছে স্বদেশে কিনা শেষে তাঁর প্রাণহীন নিথর নিস্পন্দ হিমশীতল মরদেহ। কি অবস্থা হবে শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর, কি অবস্থা হবে তাঁর প্রায় নাবালক পুত্রদের!

এই মুহূর্তে ভারতের আর এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার মুখখানা ভেসে ওঠে সত্যপ্রকাশের মানসলোকে। সে মুখ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। তাইওয়ানে সেই বিতর্কিত বিমান দুর্ঘটনার পূর্বে তিনিও নাকি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সোভিয়েৎ রাশিয়ায় যাবার। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দাচক্র ঘোষণা করে দিল যে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে সেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই প্রধান পুরুষের ঐ বিয়োগান্ত শেষ পরিণতি যেন অবিশ্বাস্য। মাঝে মাঝেই ডক্টর সত্যপ্রকাশের মনে পড়ে স্বাধীন ভারতে যদি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রথম রাষ্ট্রপতি সুভাষের শাসন বা রাজত্ব শুরু হত তবে কি রকম হত দেশের প্রশাসন? কি রূপ নিয়ে যাত্রা শুরু করত দেশ সুভাষ-রাজত্বে? সেই নেতৃত্বের প্রতি যে ডক্টর সত্যপ্রকাশের বেশ কিছুটা দুর্বলতা আছে তা বলাই বাহুল্য। সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথার স্নায়ুগুলো যেন চিড়বিড় করে ওঠে।

কি এক উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দোতলার করিডোরে গিয়ে অন্ধকারে পায়চারি করতে থাকেন তিনি।

রাতের কলকাতা তখন নিঝুম হয়ে আসছে। ট্রাম-বাসের শব্দ কমতির দিকে। একটা হিমেল হাওয়ায় যেন পরলোকগত নেতার শোকে রাতের শহরের আকাশে, ইথারে হা-হুতাশ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ কিছুটা সময় বয়ে যাবার পর ডক্টর সত্যপ্রকাশ ঘরে ঢোকেন। দেখেন টেবিলের উপর তাঁর রাতের নির্দিষ্ট আহার কয়েক টুকরো ফল, কটা সন্দেশ ও এক বাটি দুধ প্রতিদিনের মতই দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘর সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। এগিয়ে গেলেন বেসিনের কাছে। হাতে মুখে জল দিলেন। বসলেন এসে চেয়ারে, শেষ করে নিলেন নিশারাশ।

না ঘুম আসবে না এখন। সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠলে ঘুম বড় একটা আসে না। ইনসমনিয়া মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মাথা ঘামাবার মানুষদের এই এক রোগ। প্রায় সারা রাত ধরে তখন চলে এটা-সেটা বই বা পত্র-পত্রিকা পড়া। বুকসেল্‌ফ থেকে কি একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে তাতে চোখ বুলোতে লাগলেন সত্যপ্রকাশ—

অহিংস নৃশংসতা

নৃশংসতায় গান্ধীবাদীরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সারাটা দেশকে চোরাকারবারী এবং ভেজালদারদের কবলে তুলিয়া দিতে ইহাদের বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধে না বহু দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাও দেখাইয়াছি। দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রীসভা হইতে অপসারিত কৃষ্ণমাচারী এবং আই. সি. এস. হইতে বিতাড়িত এইচ. এম. প্যাটেল ইহার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। দুইজনকেই পুনরায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। প্রথম জনকে হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আনিয়াছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, দ্বিতীয় জনকে আনিয়া উচ্চপদে

বসাইয়াছেন তাঁহারই অনুগত ভক্তবৃন্দ। বাণিজ্য সচিব কৃষ্ণমাচারীকে যখন লোকসভায় প্রশ্ন করা হয় যে, কেন তিনি তাঁর পুত্রদের নামে বেআইনী আমদানী লাইসেন্স দিয়াছেন, সেই লাইসেন্স সম্পর্কিত সমুদয় তথ্য যখন লোকসভায় প্রকাশ করা হয়, তখন কৃষ্ণমাচারী একটিমাত্র জবাব দিয়াছিলেন—প্রধানমন্ত্রী ইহা জানেন। লোকসভায় এবার যখন প্রশ্ন উঠিল—এইচ. এম. প্যাটেলের পুনর্বাসন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন, তিনি ইহা জানেন না। সুবিধামত জানা এবং সুবিধামত না জানার ভাণের দ্বারা তিনি সর্বদা সামাজিক পাপ কার্যের অনুষ্ঠানে সক্রিয় সমর্থন দিয়া আসিয়াছেন! রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নায়ক প্রধানমন্ত্রী যে দেশে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার প্রেসিডেন্ট যে দেশে উহা নীরবে সহ্য করেন, সমাজের শত্রুদের বেপরোয়া আঘাতে দেশের জনসাধারণ তিলে তিলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইবে, মহামারীর কবলে পড়িবে এবং মরিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়ক কত কঠোর হস্তে চোরাকারবার এবং দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারেন, অল্পদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি তিনি ছয় ঘণ্টায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা সকলের জানা আছে বলিয়া মনে হয়। শেয়ার মার্কেট বানচাল করিয়া ধনিক গোষ্ঠী তাঁহাকে জব্দ করিতে গিয়াছিল, পারে নাই। আমরা বহুবার বলিয়াছি ভারতে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে গভর্ণমেন্ট এবং ধনিকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ যোগসাজসে। নেহেরুকে আমরা শয়তান বলিতে রাজি আছি কিন্তু নির্বোধ ভাবিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার গভর্ণমেন্ট এবং ধনিকগোষ্ঠী চোরাবাজারে যে যুক্তফ্রন্ট চালাইয়াছে তাহা যে কোন পার্লামেন্টারি কমিটির সম্মুখে আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমেরিকায় যখন ছিলাম তখন একদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম একটি প্রাদেশিক হাইকোর্টের জজ উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে ধরা পড়িয়াছেন। আমেরিকার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা বিভাগ FBI হাইকোর্টের

জজের উপরেও নজর রাখে এবং দুর্নীতি ধরিতে পারিলে তাঁহাকেও ছাড়ে না। জজের ধরা পড়ার সঙ্গে এই সংবাদও প্রকাশিত হইল যে,তিনি প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভ্রাতা এটর্নী জেনারেল রবার্ট কেনেডির অন্তরঙ্গ বন্ধু। রবার্ট কেনেডির নিকট হইতে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আমেরিকার লালবাজার FBIতে কোন টেলিফোন আসিল না, আসিল তাঁহাকে আদালতে সোপর্দ করার আদেশ। আদালত তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে জজ অবসর গ্রহণের চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবে ১৭ই জুলাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজের আদালতে পুত্র বা জামাতার প্র্যাকটিস সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ দিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে কিন্তু প্রাণের বন্ধুর প্র্যাকটিস আজও অব্যাহত আছে। সরকারের মামলায় পক্ষ সমর্থনের জন্য এডভোকেট জেনারেল, সিনিয়ার এবং জুনিয়ার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল, ডেপুটি লিগাল রিমেমব্রান্সার প্রভৃতি আছেন কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এদের সকলকে বাদ দিয়া প্রাণের বন্ধুকেই উকীল নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকাশ্য কেলেঙ্কারির কাহিনী মুখে মুখে ঘুরিলেও আমাদের দেশে ইহার কোন প্রতিকার নাই। নিরপেক্ষ বিচারের প্রয়োজনে সরকারের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, এই অপরাধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি কবে বিচারপতি জ্যোতিপ্রকাশ মিত্রের বয়স ৬০ পূর্ণ হয় তার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকেন কিন্তু অন্যের বেলায় বয়স ৬৩ হইলেও তাঁদের চোখে ঠুলি আঁটা থাকে।

আমেরিকায় থাকিতে আর একটি ঘটনা দেখিয়াছি। পেণ্টাগন বা দেশরক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে দুর্নীতির দায়ে FBI ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অপসারিত করা হয়। আমাদের দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দুর্নীতি-কৃষ্ণ মেননের দপ্তরে প্রচুর চুরি ধরিয়া রিপোর্ট দিলে অডিটার জেনারেল পার্লামেন্টে তিরস্কৃত হন; স্পীকার তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া "ভাবিয়া

চিন্তিয়া রুলিং দিব” বলিয়া সরিয়া পড়েন। এই তো অবস্থা!

দেশের সকল স্তরে আজ যে অসহায়তা দেখা দিয়াছে তার একমাত্র কারণ দেশের সর্বোচ্চ নায়কের মেরুদণ্ডের অভাব। মানুষের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করিতে দুটি জিনিষ অপরিহার্য—নীতিজ্ঞান এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস। দুটির একটিও এই ব্যক্তির নাই। নাই বলিয়াই তাঁর পক্ষে চরম নৃশংসতার স্তরে পৌঁছানো সহজ। এই কারণে তাঁরই পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে—পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করিতেই হইবে, “নচেৎ আমরা ডুবিব।” চুয়াল্লিশ কোটি লোকের দেশ—পূর্ব্ববঙ্গের ৭০ লক্ষ নির্যাতিত অপমানিত লাঞ্ছিত মানুষকে আশ্রয় দিতে পারিবে না, সে চেষ্টা করিতে গেলে “ডুবিব”—এই উক্তি একমাত্র তাহারই পক্ষে সম্ভব যেলোক নিজের চরিত্রে কাপুরুষতা এবং নৃশংসতার পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছে। অহিংসার মন্ত্র এই দুই পাপের কৈফিয়ৎ জোগাইয়াছে। এই লোক পাকিস্তানী হাই কমিশনারকে ডাকিয়া বলিতে পারিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দু আগমন দৃঢ় হস্তে বন্ধ কর! বলিতে পারেন নাই—একটি হিন্দুকে তোমরা বিতাড়িত করিলে তার পরিবর্তে একশতটি মুসলমানকে লইতে হইবে। যদি এইটুকুও তিনি পারিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতেন আয়ুব খাঁ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে পারিতেছে।

অহিংস বর্বরতা

কৃষ্ণনগর সীমান্তে অহিংস বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। পাকিস্তানী নরক হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় তিনটি নারী বিনা পাশপোর্টে ভারতে পা দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া সীমান্ত পার করিয়া দিয়া নেহেরুর সীমান্ত রক্ষীরা তাহাদের মনিবের মান এবং নিজেদের রুটি বাঁচাইয়াছে। মনে পড়ে বৃটিশ রাজত্বে

খোদাই খিদমতগারের উপর গুলিবর্ষণের জন্য বৃটিশ কমাণ্ডারের আদেশ গাড়োয়ালী সৈনিকেরা অমান্য করিতে দ্বিধা করে নাই। মানবতার বিরুদ্ধে বন্দুক না তোলার শাস্তি তাহারা মাথা পাতিয়া নিয়াছিল। লাখে লাখে পাকিস্তানীর পশ্চিমবঙ্গে স্থান হইতে পারে, স্থান হয় না তিনটি অসহায় লাঞ্ছিতা নারীর! হাজার বছরের গোলামীর মনোবৃত্তি মুছিতে সময় লাগে ইহা ঠিক, বিশেষতঃ সেই দেশের কর্ণধার যখন হয় মোগলের গোলাম।

পড়া শেষ করে হাতের পত্রিকাটার শিরোনামে দৃষ্টি ফেললেন। দেখলেন পত্রিকাটির নাম 'যুগবাণী', সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্মণ; এবং উপরোক্ত লেখা দুটি ওই পত্রিকাটির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সম্পাদকের বলিষ্ঠ লেখনীর যে এদুটি নিবন্ধ যথার্থ সাক্ষ্য তা বুঝলেন সত্যপ্রকাশ। সংখ্যাটি ৭ই জুলাই, ১৯৬২ তারিখের। সত্যপ্রকাশ ভাবতে লাগলেন যে নেহেরু-ইজম্ দেশে চলছে এতদিন তার স্তুতিতে বড় বড় সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় কলমগুলি থাকে পরিপূর্ণ। অথচ প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে পর্যন্ত এই জহরলাল নেহেরু ভারতের একটা বিশ্বাসযোগ্য মর্যাদামণ্ডিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন নি তাঁর একটানা দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে। বারবার পাকিস্তান দিয়েছে প্ররোচনা, বারবার সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে; বারবার গবাদি পশু নিয়ে গিয়েছে সীমান্ত পেরিয়ে, বারবার জীবন নিয়েছে সীমান্ত রক্ষীদের তবু তার বিরুদ্ধে সেনা মোবিলাইজ করেন নি জহরলাল। এর দ্বারা দেশের ও দেশবাসীর হয়েছে কি কোন লাভ, বেড়েছে কি আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে এ দেশের মর্যাদা? না বাড়ে নি। বাড়ে যে নাই তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে চীনা এ্যাগ্রেশনের সময়। 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' শ্লোগানের ও পঞ্চশীলের পচা বুলির প্রবক্তার মুখের বাক-সর্বস্বতা সে সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছুটতে হয়েছিল অন্নের জন্য, বিমানের জন্য পি. এল ৪৮০-র গম খাওয়ানো সেই আমেরিকার কাছে।

অথচ অল্প পরিচিত ছোট মাপের নেতা লালবাহাদুর পাকিস্তান টিথোয়ালে সীমান্ত পেরুনো মাত্র সেনা বিভাগকে হুকুম দিয়েছেন আক্রমণের যথার্থ জবাব দিতে। পাকিস্তান ভারতীয় সেনাদের হাতে বেধড়ক মার খাওয়ায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিশারদদের কাছে বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের সামরিক শক্তির। আমেরিকার কাছ থেকে খয়রাত পাওয়া ট্যাঙ্ক ও অস্ত্র যথাযথভাবে ব্যবহার পর্যন্ত করতে পারেনি পাক সেনাদল। ফলে তাকে ছুটতে হয়েছে সীমান্ত সন্নিহিত বৃহৎ রাষ্ট্র সোভিয়েৎ রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে। সোভিয়েৎ ছুটে এসেছে মধ্যস্থতা করতে পাক-ভারত যুদ্ধের ও মন কষাকষির পরিসমাপ্তি ঘটাতে। সেই সন্ধি আলোচনায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন ভারতীয় চরিত্রের ঠাণ্ডা মেজাজের বেঁটে-খাটো মাপের নেতা লালবাহাদুর, আর সেই সন্ধি আলোচনার শেষ পরিণতি কিনা প্রবাসে প্রাণ বিসর্জন। প্রাণ দিয়ে দেশের কাছ থেকে ও জাতির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছেন অকালে লালবাহাদুর, হ্যাঁ, এ মৃত্যু অকাল মৃত্যু বৈকি? এ মৃত্যু প্রকৃতই ভারতের জাতীয় ক্ষতি।

আর একটি মুখ সত্যপ্রকাশের মনলোকে ভেসে ওঠে যে কিনা ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীরে হঠাৎই প্রাণ হারিয়েছিলেন। সে মৃত্যুও ছিল রহস্যাবৃত। হ্যাঁ বাংলার ব্যাঘ্র সন্তান—শ্যামাপ্রসাদের কথা তাঁর মনে পড়ে। সে মৃত্যু নিয়েও নানা জনের মনে নানা প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল। তিন তিন জন ভারতীয় সুসন্তানের রহস্যাবৃত মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের মনে চিন্তার ঝড় ওঠে। ঐ তিনজনই দেশকে ভালবেসেছিলেন দেশের মাটিকে, দেশবাসীকে তাঁদের বিরাট হৃদয়ের ভালবাসা প্রীতি প্রেম উজার করে দিয়ে।

ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যপ্রকাশ বইয়ের তাক থেকে দেখেশুনে আর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা টেনে বের করে নিলেন। তারপর উল্টে চললেন পত্রিকাটির পাতা। একটি পৃষ্ঠায় তাঁর চোখের দৃষ্টি স্তব্ধ হল। আলোচনার নাম—'স্বামী বিবেকানন্দ', রচয়িতা সুভাষচন্দ্র বসু। সত্যপ্রকাশের মনে প্রশ্ন জাগল—অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন স্বামী

বিবেকানন্দের বীর্যবত্তা পরিপূর্ণ ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রে। বিবেকানন্দের মতই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও বিবেক-নির্ভর দেশসেবার মহাব্রত নিয়ে নতুন ভাবধারার রাজনৈতিক আদর্শ রূপায়ণে সুভাষচন্দ্র নিয়োজিত। দেশের মানুষের প্রতি তাই তাঁর মনোভাব শিবজ্ঞানে জীবসেবা—দেশসেবা। ফলতঃ তিনি দেশের অন্যসব ক্ষমতাপাগল তথাকথিত নেতাদের মত নন। এহেন সুভাষ স্বামীজী সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন তা জানতে সত্যপ্রকাশ সাগ্রহে চোখ বুলাতে থাকেন রচনাটিতে—

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে যে রচনা-সম্ভার গড়ে উঠেছে তা মনকে প্রকৃতই গভীর ভাবে স্পর্শ করে। বিশেষ করে, ধারাবাহিক-ভাবে সাজানো তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও আলাপআলোচনার বিবরণ শুধুমাত্র হৃদয়গ্রাহী নহে, গভীর ভাবব্যঞ্জকও, এমনকি তাঁর বক্তৃতাবলী অথবা লিখিত গ্রন্থরাশি অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখতে বসলেই আমি অন্তর্মুখী আনন্দে বিহ্বল না হয়ে পারি না। তাঁকে বুঝে নেবার বা তলিয়ে দেখবার যোগ্যতা খুব কম লোকেরই ছিল, এমনকি যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদেরও সেই যোগ্যতা ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর ব্যক্তিত্ব রূপায়িত হয়ে উঠেছিল ভাব-সমৃদ্ধিতে, ভাব-গাম্ভীর্যে ও ভাব-বৈচিত্র্যে। তাঁর উপদেশ ও রচনাবলী হতে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে স্বরূপ ফুটে ওঠে, তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট তাঁর আত্মিক চরিত্র। তাঁর দেশবাসী, বিশেষ করে বাঙালীদের ওপর তিনি যে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই প্রভাবের মূল উৎস ছিল তাঁর মৌলিক আত্মিক চরিত্রে। এরূপ পৌরুষ ছাড়া বাঙালী জাতি কিছুতেই প্রভাবান্বিত হতে পারতো না।

তাঁর ভয়ভাবনাশূন্য ত্যাগব্রত, তাঁর অক্লান্ত কর্মচাঞ্চল্য, তাঁর

অপার প্রেমসিন্ধু, তাঁর সর্বতোমুখী জ্ঞান-সত্তা, তাঁর প্রবল হৃদয়াবেগ, তাঁর নিষ্করুণ আক্রমণ-বৃত্তি অথচ তাঁর অপূর্ব শিশুসারল্য—তাঁর মতো এরূপ বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব আমাদের এ মর্ত্যলোকের মধ্যে কদাপি দৃষ্ট হয়। 'দি মাস্টার য়্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন যে হৃদয়বাণী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর ধর্মউপদেশ সমূহে আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন তাঁর আক্রমণাত্মক যুক্তি-তথ্য বাণ যা তিনি নিক্ষেপ করেছেন অসঙ্কোচে পুরোহিত সম্প্রদায়, উচ্চবর্ণী ও ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সর্বাপেক্ষা যুক্তিবাদীর পক্ষে ইহা পরম গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আধ্যাত্মিক মোহান্ধ বলতে যা বুঝায় তা বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করতে পারেনি স্বামীজীর জীবনালোকে। আধ্যাত্মিক কূপমণ্ডুকতা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। অলীক কল্পনা-ধর্মবাদীগণের নিকট তিনি বলতেন, 'ফুটবল ক্রীড়াদির মাধ্যমেই মুক্তি লাভ ঘটবে, গীতা পাঠের দ্বারা নহে'! যদিও তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন, তথাপি তিনি ভগবান বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদিন তিনি ভক্তির আবেগভরে বুদ্ধের কথা বলে চলেছিলেন, এমন সময় একজন শ্রোতা তাঁকে এ প্রশ্ন করে বসেন, 'আপনি কি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী?' সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভক্তির ধারা প্রবলবেগে উৎসারিত হলো এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন, 'কি? আমি বৌদ্ধ কি না! আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাসের দাস।' বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতেন। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন,—'শঙ্করাচার্যের মননশীলতা ও বুদ্ধের মহানুভবতা'—এ দুইটি হওয়া উচিত আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্থল।'

যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে স্বামীজী আলাপ করতে করতে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন; সেই সময় হঠাৎ উপরোক্ত একই ধরণের প্রশ্নবাণে তাঁকে বিদ্ধ করা হয়। প্রশ্ন শুনেই তিনি গম্ভীর ও কঠোর মনো-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন; গুরুগম্ভীর স্বরে জানান 'নাজারেথের যীশুর সময় উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর পদযুগল আমার নয়নাশ্রু দিয়ে

অভিষিক্ত করতুম, আমার হৃদয়ের রক্তধারাতেই তা বিধৌত করতুম।

পদদলিত লাঞ্ছিত জনসাধারণের জন্য তাঁর সমবেদনা কতখানি গভীর ছিল, এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো উহা সাগরসদৃশ ছিল। আপনাদের নিশ্চয় তাঁর সেই অমর বাণীর কথা স্মরণে আছে, 'ভাইগণ বলে সম্বোধন করো। বস্ত্রহীন ভারতবাসী, নিরক্ষর ভারতবাসী, অপাঙক্তেয় ভারতবাসী আমার ভাই। তোমাদের কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত হোক ভাইয়ের ডাক। ভারতের দেবদেবী আমার উপাস্য দেবতা। এবং দিনরাত্র প্রার্থনা করো, 'ওহে! গৌরীর প্রভু! ওহে! শক্তিরূপিণী জননী! আমার সকল দৌর্বল্য অপহরণ করো, আমার কাপুরুষতা দূরীভূত করো, আমাকে মানুষ করে তোলো।'

স্বামীজী ছিলেন পূর্ণবীর্যবত্তাসম্পন্ন পুরুষ, মনে প্রাণে তিনি ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। স্বভাবত তিনি ছিলেন শক্তির পূজারী; দেশবাসীর মনের সংস্কার সাধনের জন্য তিনি বেদান্তের চিন্তাধারার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা পরিবেশন করেছিলেন। শক্তি, যে শক্তির কথা উপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই 'শক্তিমন্ত্র' তাঁর কণ্ঠে প্রায়ই ধ্বনিত হতো। চরিত্র গঠনের ওপরেই তিনি বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন।

আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সম্বন্ধে আলাপ করে চললেও এ অসাধারণ পুরুষের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে বলে আমার মনে হবে না। এত মহৎ এত গভীর, এত বিচিত্র ভাব ও গুণের সমাবেশ আর কাহারও মধ্যে দেখি না। 'তিনি ছিলেন উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তরের যোগী। তাঁর সঙ্গে ছিল পরম সত্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ। তাঁর জাতি তথা মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।' এ দৃষ্টিভঙ্গি-তেই আমি তাঁকে বর্ণনা করবো। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমি তাঁর পদতলে আসীন হতুম, আমায় যদি ভুল না বুঝেন তবে আমি বলবো, আধুনিক বাংলার স্রষ্টা তিনি।

স্বামী দয়ানন্দ বা আর্যসমাজীরা যে ধরণের সংগঠনের পরিকল্পনা করেছেন, সেই ধরণের প্রতি স্বামীজী মোটেই আগ্রহশীল বা সচেষ্ট ছিলেন না। উহাতে একটা ত্রুটিজনিত দৌর্বল্য থাকতে পারে ; কিন্তু তিনি স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন,—'মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের লক্ষ্য।' তিনি ইহা ভালভাবে জানতেন যে দেশমাতা যদি প্রকৃত মহাপুরুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তবে সঙ্ঘ অবিলম্বে আপনা হতেই গঠিত হবে। তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের শিক্ষাদানে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করেছেন ; তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত সত্তাকে সঙ্কুচিত বা তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে খর্ব করতেন না। শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত শিষ্যকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, কোন বড় বৃক্ষের ছায়াতলে অপর কোন বড় গাছ উঠতে পারে না।

আমাদের পরবর্তীকালে মহাপুরুষদের সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য। এঁরা স্বাধীন মত বরদাস্ত করতে পারে না ; এঁদের কাম্য শুধু আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে তাঁদের শ্রীচরণে বিকিয়ে দেবো এবং তাঁদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে থাকবো।

সত্যপ্রকাশের মনে হয় সুভাষের চরিত্র বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব বীর্যবত্তারই পরবর্তী ফল। ঐ পত্রিকারই কয়েকটি পাতা উল্টে তিনি আর একটি প্রবন্ধে চোখ বুলাতে থাকেন—

'সোনান' রেডিও থেকে প্রচারিত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নেতাজীর আহ্বান কি শুনেছিল তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ?

অহিংসবাদ যে সাপের চেয়েও বেশী কুটিল তার প্রমাণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কি এত দিনে পাননি ? আপনাদের মনে থাকতে পারে যে স্বাধীনতার পরপরই মজঃফরপুরে, সম্ভবত ষ্টেশনে 'ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয় গান'—তাঁদের অন্যতম ক্ষুদিরাম

বসুর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন প্রধান মন্ত্রী নেহেরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবরণ উন্মোচনের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। যুক্তি দেখান, "যেহেতু সংগ্রামী ক্ষুদিরাম যে নীতিতে বিশ্বাসী, আমি সে নীতিতে বিশ্বাস করিনে, সেইহেতু আবরণ উন্মোচন করব না আমি।"

পণ্ডিত নেহেরুর এমন উক্তি শুনে হাততালি দেবার মত দালাল যে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক আছে সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পণ্ডিত নেহেরুই যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে যান, তখন তথাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈনিকদের স্ট্যাচুতে প্রোটকল-এর নির্দেশেই সম্ভবতঃ মালা দেন তিনি। তবে কি মনে করব আমরা আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামীরা অহিংস ছিল ?

পণ্ডিত নেহেরুর এরূপ আচরণের পশ্চাতে যে মনোভাব লুক্কায়িত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই—অর্থাৎ গান্ধীজীর চেলা হিসাবে দেশে সর্বদা তিনি অহিংস নীতির জয়গানের জয়ঢাক পিটিয়ে গেছেন বেশ উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই। স্বদেশের লোককে সর্বদা কংগ্রেসের নেহেরু এণ্ড কোম্পানী বোঝাতে চেয়েছেন যে "গান্ধীর অহিংস নীতির কি মহিমা"। যে দেশে ৯০% লোক অশিক্ষিত, সে দেশের জনতাকে এ ভাবে প্রচারের মাধ্যমে বোঝানো যে কত সহজ তা তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

এই মনোভাবেরই প্রকাশ দেখা যায় ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার সময় বিপ্লবীদের সংগ্রামী অবদান বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে—যে বিকৃতি সহ্য করতে না পেরে ইতিহাসবেত্তা ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার কলম ভেঙ্গে চলে এসেছেন। কিন্তু সেই মিথ্যার ইতিহাস সমাপ্ত করা হয়েছে ডঃ তারাচাঁদকে দিয়ে।

এই যে মিথ্যা, এই যে অসত্য এইটিই কি নেহেরু তথা গান্ধী শিষ্যদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি আমরা আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করে আই. এন. এ-র সৈনিকদের নিয়ে

যখন ইম্ফলে ভারত সীমান্তে বৃটিশ সৈনিকদের সঙ্গে লড়ছেন নেতাজী তখনকার দিনে ফিরে যাই, তবে কী দেখতে পাই? জাপানীদের দখলে তখন সিঙ্গাপুর যার নতুন নামকরণ হ'য়েছে 'সোনান'। সোনান রেডিও থেকে নেতাজী আহ্বান জানাচ্ছেন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে—
"GIVE ME BLOOD, I WILL GIVE YOU FREEDOM"

নেতাজীর তখনকার আহ্বান ব্ল্যাক আউটের দিনে সতর্কতার সঙ্গে কপাট বন্ধ করে অনেক ভারতীয়ই শুনেছিলেন। কিন্তু শোনেন নি কেবল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ব্যাপারটা কি আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য মনে হয় না?

যদি আমরা ধরে নিই যে, গান্ধী-কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ নেতাজীর সে আহ্বান শোনেন নি, তবে কি আমরা মনে করতে পারি না যে সেই নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেতৃপদে বৃত হবার কোন গুণই ছিল না। যুদ্ধকালে যখন ভারতের বিদেশী রাজ বৃটিশ বিপদগ্রস্ত, যখন এশিয়াবাসী জাপানীদের কাছে বেধড়ক মার খাচ্ছে বৃটিশ সিংহ, যখন স্বদেশে রুটির জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে চার্চিল, ভারতেও সুরু হয়েছে তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বৃটিশের উপর আঘাত হানতে পারলেন না আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধী-গ্রুপ। এ যেকোন দেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষে কতবড় কর্তব্যে অবহেলা, তা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই বুঝবেন চোখ বুঁজেও। দেউলিয়া নেতৃত্ব তখন বুলি সর্বস্ব বড়াই করে বলছে, "বৃটিশ যখন বিপদগ্রস্ত তখন তাদের ওপর আঘাত হানব না আমরা।" এ যেন কোন বিড়াল তপস্বীর মুখনিঃসৃত বাণী নয় কি? এক দিকে আমরা বলছি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম [যদিও অহিংস। অর্থাৎ 'কাঁটালের আমসত্ত্ব' আর কি] করছি অথচ যার সঙ্গে সংগ্রাম করছি তার বিপদে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না। তওবা! তওবা! সুতরাং ধরে নিতে পারি যে নেতৃবৃন্দ যদি নেতাজীর আহ্বান না শুনে থাকেন তবে তাঁরা যে ভুল করেছেন তা 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' রূপে অভিহিত হতে পারে।

কিন্তু নেতৃবৃন্দ নেতাজীর সে আহ্বান শোনেন নি, এ ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য নয় এই জন্য যে, ঠিক তখনই জনযুদ্ধওলারা কলকাতার পথে পথে চেঁচিয়ে বলছে—

রুশ কি লড়াই
হাম কি লড়াই—

সে সময় রুশপন্থী কম্যুনিষ্টরা বৃটিশের বড় ভক্ত। কারণ রাশিয়া বৃটিশের মিত্রশক্তি। ঠেলায় পড়লে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় বই কি।

ঐ জনযুদ্ধ তখন নেতাজীর যে সকল কার্টুন ছাপত, তা নিশ্চয়ই গান্ধী-নেহেরু কোম্পানীর নজরে পড়ত। মহামতি গান্ধী তখন বেশী মুখ না খুললেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নেতাজীকে জাপানী দালাল বলে ধরে নিয়েছিলেন বলা যেতে পারে না কি? নতুবা তখন তিনি কেন বিবৃতি দেবেন যাতে জনতা জানল যে জাপানীদের সহায়তা নিয়ে যদি সুভাষচন্দ্র আসেন তবে তিনি (পণ্ডিত নেহেরু) তরবারির মুখে তাঁকে স্বাগত জানাবেন।

আশ্চর্য্য! আজীবন অহিংস সংগ্রামী নেহেরু ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিতে মালা দিতে কুণ্ঠিত, বৃটিশকে যুদ্ধকালে বিব্রত করতে কুণ্ঠিত, কিন্তু কুণ্ঠিত নন কেবল সুভাষচন্দ্রের বুক লক্ষ্য করে তরবারি বাগাতে। এরূপ বিবৃতি দেবার সময় মহাশয় ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি আজীবন অহিংস নীতির পূজারী, তিনি তাঁর বাপুজীর মানসপুত্র। হায়! নেহেরুর ইদানীন্তন উক্তি কি প্রমাণ করে না যে স্বরাজ যদি সহিংস পন্থায় এনেও ফেলতেন সুভাষচন্দ্র, তবে সে স্বরাজ-লাড্ডু খেতে হয়তো বমি হয়ে যেত পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ খাঁটি অহিংস ব্র্যাণ্ড মানুষদের। আসল কথা স্বরাজটা টুপ করে যদি অহিংস পূজারীদের মুখে নাই পড়ে পাকা ফলটির মত, তবে পৈত্রিক জমিদারী দেখাশোনা না করে বেহদ্দ হয়ে সত্যাগ্রহ করে ফয়দা হল কি?

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসুক এ সইতে পারতেন না অহিংস কংগ্রেস বাস

প্রধান নিয়ন্তা তখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং যেহেতু কংগ্রেসে গান্ধীপন্থীদের ছিল একাধিপত্য, সেইহেতু তারা ছলে বলে কৌশলে স্বরাজ নিজেদের করায়ত্ত করতে কোনরূপ ত্রুটি রাখে নি।

রচনাটি পড়া শেষ হতেই ইতিহাসবেত্তা ডক্টর সত্যপ্রকাশের মনের দর্পণে যেন জ্বলজ্বলে আখরে ভেসে ওঠে স্বদেশের মাটিতে থাকাকালে গান্ধী-গ্রূপ সম্পর্কে সুভাষের যে ধারণা হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক উপলব্ধি। সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই—১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী বলেছিলেন—"গান্ধী আন্দোলন যে আজ শুধু নিয়মতান্ত্রিকতার কবলীভূত হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে কর্তৃত্বের মোহও তাকে গ্রাস করেছে। সাংগ্রামিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু পরিমাণে কর্তৃত্বভাব থাকা স্বাভাবিক এবং তা মেনে নেওয়াও চলে কিন্তু কর্তৃত্ব-ভাবের যে বাড়াবাড়ি আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারও সে একই কারণ। মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণের পর গান্ধীপন্থীরা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছেন; এ ক্ষমতায় ভবিষ্যতে যাতে শুধু তাঁদের এক চেটিয়া অধিকার থাকে তারই জন্যে তাঁরা এখন ব্যগ্র। ইদানীং কংগ্রেসের মধ্যে যা চলছে তা নিছক 'ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতি'—যদিও বলতে গেলে খানিকটা নকল ধরণের। এই ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতির উৎসস্থল হল ওয়ার্দ্ধা। গান্ধীপন্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে চিরকাল তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেন, তার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধীতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়াই হল এই ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতির লক্ষ্য। ......গান্ধীপন্থীরা অবশ্যই কংগ্রেস থেকে বিরোধী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত ক'রে একে একটা ঘন সন্নিবিষ্ট গোষ্ঠীতে পরিণত করতে পারেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারেন।"

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!! স্বাধীনতা! কথাটা ঐতিহাসিক সত্য-প্রকাশের মস্তিষ্কে মানসে মজ্জায় যেন ঘা মারতে থাকে। ভাবেন

কংগ্রেস বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কাছে যদি স্বাধীনতাই না চেয়ে, থাকে তবে কি চেয়েছিল ?

উত্তেজনায় সত্যপ্রকাশের দেহ-মন-মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনায় অস্থির হয়ে তিনি কেদারা ছেড়ে উঠে পড়েন। নিঝুম রাতের আলো-আঁধারি বারান্দায় গিয়ে অস্থির চঞ্চল পায়ে পায়চারি করতে থাকেন। মনের মধ্যে তাঁর একটি প্রশ্ন যেন গুমরে গুমরে ওঠে—ইংরেজের কাছে তবে কংগ্রেস কি চেয়েছিল ? যা চেয়েছিল, যেমন করে চেয়েছিল—তা কি তেমন করেই পেয়েছে ? যদি পেয়েই থাকে তবে দেশে কেন চলছে আজ চরিত্র-ভ্রষ্টতার বন্যা ? কেন ধনী হচ্ছে আরও ধনী—গরীব হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন আরও নিঃস্ব ? ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া-র বক্তব্যানুসারে কেন কালোবাজারীরা শাস্তি পায়নি, কেন বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন কল্যাণকর মত প্রকাশে আশ্রয় নিচ্ছে কাপট্যের ? কেন তাদের কাছে জীবনের সব মূল্যবোধ বিসর্জিত হয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে শুধুমাত্র অর্থের, কারেন্সী নোটের ? কেন লোভ-লালসায় আচ্ছন্ন হচ্ছে তাদের মন-বিবেক ? কেন দেশের মানুষ অর্থের বিনিময়ে বিসর্জন দিচ্ছে সব যুগের, সব দেশের, সব মতের, সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ বস্তু মানবিক বোধ ? কেন প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা দেশবাসীর কাছ থেকে পলায়ন করে ? কি করে আজ ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজার, খাদ্যে ভেজাল দান, ফাটকা, জাল-জুয়া-চুরি, মস্তান-ইজম্, সততাহীনতা ও সতীত্বহীনতার অক্টোপাশ সমাজ-দেহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ? এই দুর্নীতিগুলোর প্রশ্রয়দাতা কি স্বাধীন সরকারের প্রশাসনিক ট্রাকচার নয় ? যে দেশের বিদ্যাসাগর বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনে প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছেন 'সদা সত্য কথা বলিবে' এবং 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়'—সে দেশে কেন চলে ছিনতাই, কি করে চলে ওয়াগন ব্রেকিং-এ জাতীয় ক্ষতি সাধন, কি করে চলে জাতীয় সম্পত্তি রেল-কামরার ও আসবাবপত্রের নির্দয় ক্ষতিসাধন ? কি করে সর্বোচ্চ প্রশাসককে পর্যন্ত উৎকোচে বিভ্রান্ত করা যায় ? যদি এই সকল জাতীয় ক্ষতি নিরসনে

তৎপর থাকত প্রশাসনিক জাগরিত দৃষ্টি তবে কি এ সব বৃদ্ধি পেতে পারে? যে স্বাধীন সরকারের পরিচয় চিহ্ন বা এম্‌ব্লেমের বাণী 'সত্যমেব জয়তে' সেই সরকারের কোন সৎ কর্মী সাহস ও সততার সঙ্গে কোন কাজ করতে গিয়ে, জনকল্যাণ করতে গিয়ে কি কারণে অধিকাংশ সরকারী সহকর্মীদের দ্বারা 'আজব জীব' হিসাবে চিহ্নিত হয়? কেন তাকে দুর্নীতিগ্রস্তরা বাধ্য করে ঘুষ নিতে, দুর্নীতির পঙ্ক-কুণ্ডে এঁদো ড্রেনের পোকার মত প্রশাসন দেহে পচন ধরাতে? কেন সেই সৎ কর্মচারি সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছে জানাতে সুযোগ পায় না তার প্রকৃত নালিশ, অভিযোগ?

ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশ ভেবে দেখেন—যদি উচ্চ স্তরের নেতৃত্ব, দেশ থেকে, সমাজ থেকে, প্রশাসন থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতেই চায় তবে কি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। জাতীয় কল্যাণকর মানসিকতার প্রশাসকরাই বা কেন অধস্তন কর্ম-চারিদের সহায়তা পায় না পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে? কেন প্রশাসনে এই স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ সময়ে গড়ে উঠলো না—এসো আমরা দেশের কাজ করি—দশের কাজ করি 'দশে মিলি করি কাজ —নাহি ভয় নাহি লাজ' নীতি? তবে কি ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা গ্রহণের যে ঘটনা—তার মধ্যেই কোন দুর্নীতির পচনশক্তি রয়ে গিয়েছে? 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার'-এর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে না ১৯৯৯ সালের আগে। সেই প্রকৃত ঘটনার মধ্যে কি জাতীয় নেতাদের ক্লেদাক্ত ভূমিকার ছবি বা ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাবে? কিন্তু যে ঐতিহাসিক উপাদান এখন, এই মুহূর্তে পাওয়া যাবে না—তা নিয়ে ত মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের মনে এমনই নানা প্রশ্নের ঢেউ একের পর এক উঠতে থাকে। স্বাধীনতা যে-ভারতীয় নেতাদের হাতে ইংরেজ 'দিল্লীর লাড্ডু'-র মত দিয়ে গিয়েছে তাদের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের মনে সন্দেহের কণা যেন চকচকিয়ে ওঠে। তাক থেকে সুনীলকুমার গুহর লেখা 'স্বাধীনতার আবোলতাবোল' বইটি টেনে নিয়ে খানিক

উল্টেপাল্টে অবশেষে এক জায়গায় মনোযোগ সহকারে তিনি চোখ বুলাতে থাকেন—

মো. ক. গান্ধী

"১৯২১ সালে গান্ধী নেতৃত্বে যাবার পর থেকে অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে গণসংযোগ হয়েছিল খুব বিপুল ভাবেই। কিন্তু কংগ্রেস যে কখনও সত্যিকারের সংগ্রামী সংস্থা হিসাবে দেশের সম্মুখে আসেনি, সে অতি সত্যি কথা। প্রচার কার্যের ধূম্রজালে এই সত্যটিকে যতই ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হোক না কেন, সত্যটি সত্যই থেকে গেছে। ইংরেজের সঙ্গে প্রেমপিরীতি এবং আপোষ রক্ষার অবসরে ১৯২১ সালে, ১৯৩০ সালে এবং ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে আন্দোলন করেছে তাকে যারা স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে চায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। আর যারা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের আলোচনা ইতিহাস-নিরপেক্ষ ভাবে করবে তাদের কথা হচ্ছে স্বতন্ত্র। গান্ধী, জহরলালের মৃত্যুর আরও পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা ইতিহাস লিখতে বসবেন তাঁরা সত্যিকথা সোজাভাবেই লিখতে পারবেন যে ভারতে গান্ধী-নেতৃত্ব এসেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে সম্মুখে এগিয়ে দেবার জন্য নয়, গান্ধী-নেতৃত্ব এসেছিল বিবেকানন্দের শক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে যে শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, তাকেই বাধা দেবার জন্য। ১৯০৬ সালে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল, ভারতের গান্ধী-নেতৃত্বও আমদানী হয়েছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে। যদি কারও উপর প্রভুত্ব করতে হয় তাহলে আগে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট ... নষ্ট দিতে হবে—তাকে আধা-পশু আধা-মানুষে পরিণত ক... মনে হয় না ঠিক এই জন্যেই ইংরেজ চেষ্টা করেছিল আফিম খ... তার ফাইল ত দেশটাকে নষ্ট করতে। চীনেদের পেটপুরে ... জিন্না সাহেব আর অধিকার ইংরেজের আছে এবং সেই অধিকার ... তোজীর মৃত্যু প্রমাণ

ইংরেজ সেখানে একটা লড়াই করেছিল, ইতিহাস যার নাম দিয়েছে আফিম্ যুদ্ধ (opium war)। বহু শত বৎসরের পরাধীনতার ফলে ভারতে মনুষ্যত্বের অবশিষ্ট প্রায় কিছুই ছিল না, ফলে ইংরেজ এখানে আফিম খাওয়ার অত হাঙ্গামা করতে যায়নি ; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীজীর মাধ্যমে অতি সুকৌশলে এখানে যা চালু করেছে তা যে চীনের আফিমের চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ধর্মপ্রাণ ভারতের মাটিতে অহিংসা আর আধ্যাত্মের বুলি আফিমের চেয়েও অনেক জোরালো কাজ করেছে। শক্তির স্রোতকে বন্ধ করে দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে দেশে দুর্বলতা আর ক্লৈব্যতা, ভেঙ্গে দিয়েছে দেশের বিপ্লবী ভাবধারা, চুরমার করে দিয়েছে শক্তি কেন্দ্রগুলি। ইংরেজের বাহাদুরী প্রমাণিত হয়েছে, প্রমাণ হয়েছে এই জন্যই যে, দেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল ১৯০৪ সাল থেকে, যে আগুনের খেলা চলেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে, এমন কি ১৯৩০ সালেও যে আগুনের শিখা দেখা গিয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্যে, ভারতে সে আগুনের অবশেষ আর দেখা যায় নি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুভদিনে।......একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব কাজ করেছিলেন। তাই অনেক সময় মনে হয়, ভাগ্যিস সেদিন ঐ অহিংসাজীবীরা তাদের কথায় চাপা দেওয়া অতি ক্রূর হিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখতে পারে নি ; ভাগ্যিস সেদিন তারা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে লাথি মেরে কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছিল ; তা না হলে আজও আমরা কোথায় থাকতাম, কে জানে! কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া মানে যে ক্লৈব্যতা থেকে মুক্তি দেওয়া, সেদিন হয়ত সেটা অনেকেই বুঝতে এমন নি।

যে-ভারতীয় যে ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার জন্য নেতৃত্ব দান গিয়েছে তাদের জন না, এসেছিলেন বিপ্লবী ভারতকে ধ্বংস করতে, মনে সন্দেহের কণলছিলেন ভারতের নবসঞ্চারিত শক্তিকে, এ একটা গুহর লেখা 'স্বাধীনষত্য বলেই একে আর বেশী দিন চেপে রাখাও

সম্ভব হবে না, চেপে রাখা সম্ভব হয়ও নি। এই ত সেদিন,(ভারতের মাটিতে গান্ধীজীর প্রথম শিষ্য এবং প্রধান বন্ধু শ্রীরাজাগোপালাচারী বি. বি. সি-র প্রচারের জন্য গান্ধীজীর বিষয়ে এক বক্তৃতায় বলেই ফেললেন, "গান্ধী-ইজম ভারতে ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করেনি, ধ্বংস করেছে ভারতের সন্ত্রাসবাদকে")। এখনও গান্ধীজীর মানসপুত্র জহরলাল ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এখনই যদি শ্রীরাজাগোপালাচারীর মুখ থেকে এহেন সত্য বের হতে থাকে, জহরলালের ক্ষমতা শেষে আরও অনেক সত্য প্রকাশের আশা করা নিশ্চয়ই খুব অন্যায় হবে না। (কেশকারের সাম্প্রতিক বিবৃতি কি এ মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে না?)

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হাতে পাবার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল একদিন বলেছিলেন যে, ইংরেজ যাবার সময় অনেক গোপন ফাইল নষ্ট করে দিয়ে গেছে, এমন কি রাজনৈতিক নেতাদের বিষয় ফাইলে কি থাকত, সেটা তিনি দেখতে পাননি। রাজনৈতিক নেতাদের ফাইল নষ্ট করে যাওয়াই ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে তথাকথিত অনেক রাজনৈতিক নেতাই ত বাইরে যে সব কাজকর্ম করেন তার তলে তলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তার উল্টোটাও করেন। এসব রেকর্ডের ফাইল দেশের জনসাধারণের হাতে না পড়াই উচিত। তাই গোপন ফাইল কারুরই ছিল না, সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংস অবতার নেতার ফাইলও নষ্ট থেকে বাদ পড়েনি। কিন্তু আজ যদি কেউ বলে যে, সর্দার প্যাটেল ভুল দেখেছিল, সব রাজনৈতিক নেতার ফাইল মোটেই নষ্ট করা হয়নি; তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব, গুরুদেব যাঁদের ফাইল দেখবার জন্য খুঁজেছিলেন, তাদের অনেকেরই ফাইল শুধু তিনি পাননি, নষ্ট করিয়েছিলেন, তাহলে ব্যাপারটা একটু কিরকম কিরকম মনে হয় না কি? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বা অন্য কোন বিপ্লবী নেতার ফাইল ত নষ্ট করা হয়নি, নষ্ট করা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর, জিন্না সাহেব আর ঐ ধরণের অন্য অনেক বড় নেতার ফাইল। নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ

করবার জন্য যে এনকোয়ারী কমিশন বসানো হয়েছিল, তারই রিপোর্টে পাওয়া যাবে যে, সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে বিরাট ফাইলটি ভালভাবেই আছে, এমনকি পোকায়ও বিশেষ কাটবার সুযোগ পায়নি। এই "আবোল তাবোল" লেখাটিতে গান্ধীজীর মহামানবতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, গান্ধী-রাজনীতিও ঐ সন্দেহ থেকে বাদ পড়েনি, এবং আশাপ্রকাশ করা হয়েছে যে, সময় এবং সুযোগ মত আরও অনেক গোপন খবর প্রকাশ পাবে। ফলে, বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অহিংস গান্ধী ভক্তদের কাছ থেকে অতি হিংস্র এবং অশ্লীল মন্তব্যসহ চিঠি লেখকের হস্তগত হতেও দেরী হয়নি। ব্যাপারটি যে খুবই স্বাভাবিক সে ত এই বইতেই প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে ; তাই আশ্চর্যেরও কিছু নেই যে মহাত্মার তিরিশ বৎসরের সত্য, প্রেম এবং অহিংসা প্রচারের ফলে সত্য আজ ভারতের উপকূল ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, আর অতিক্রূর হিংসা এবং দুর্নীতিতে ভারতের আকাশ বাতাস বিষাক্ত। সেই মহাত্মার মাহাত্ম্যে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা বৈকি! শুধু তাই নয় ঐ কারণেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দেশ' বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে, লেখকের সমালোচনা করেছেন, ঠিক অশ্লীল ভাষায় না হলেও প্রায় সেমিঅশ্লীল ভাষাতে ত বটেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতাশীলদের বা তাদের আত্মীয় স্বজন বা গুরুদেবের গুণ মহিমা কীর্তন করাই বর্তমানে অনেকের ব্যবসায়ের প্রধান মূলধন। আশ্চর্য শুধু এইটুকুই যে, (গত ১০ই আগস্ট সংখ্যা 'দেশ'-এ লেখকের আত্মশ্রাদ্ধ করবার পরই ১৭ই আগস্ট সংখ্যায় ঐ বিখ্যাত দেশ সাপ্তাহিকেই ভি. এম. চাওজী নামক বোম্বাইয়ের জনৈক পুলিশ অফিসারের লিখিত "সেবাগ্রামে পুলিশ" শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে, ঐ লেখাটিতে লেখক চাওজী—যিনি বহুদিন ওয়ার্ধা থানাতে দারোগা ছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর বিশেষ জানাশুনাও ছিল, গান্ধীজীর মহানুভবতা প্রকাশের ছলে বেশ পরিষ্কার ভাবেই গান্ধীজীর বিষয়ে

দুটি অতি গোপন খবর প্রকাশ করে দিয়েছেন। খবর দুটির প্রথমটি হচ্ছে গান্ধীজী কিভাবে একজন বিপ্লবী কর্মীকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে সাহায্য করেছিলেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সদাশয় ইংরেজ সরকার মহানুভব গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার্থে কিভাবে একজন গোয়েন্দা পুলিশকে গান্ধীজীর কুটিরের নিকট সব সময়ের জন্য মোতায়েন করেছিলেন।) ঐ বিপ্লবী কর্মীটিকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করবার জন্যই ইংরেজ সরকার গান্ধীজীর জীবন বিপন্ন হতে পারে সন্দেহ করেছিলেন কিনা, সেটা অবশ্য লেখক চাওজী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। এই সংবাদ দুটি প্রকাশের ব্যাপারের উপরও নূতন কোন টীকা একান্তই নিষ্প্রয়োজন, শুধু ভাবি ঐ লেখাটি 'দেশ' হেন গান্ধী-ভক্ত পত্রিকাতে প্রকাশিত হল কিভাবে? অতিবিদ্যা এবং বুদ্ধিসাগর 'দেশ'-পরিচালকেরা চাওজীর লেখাটিকে "গান্ধী প্রশস্তি গায়ন" মনে করেই ছেপে বসেছেন নাকি? ব্যাপার কি? পত্রিকা সম্পাদনার স্টানডার্ড আজকাল এই পর্যায়েই এসেছে। 'দেশ' পত্রিকার মালিক আবার নিজেই এবং মালিকানা খাতিরেই সম্পাদক হয়ে বসেছেন তাই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার। তবে গান্ধীজীর বিষয় এই ধরণের আরও অনেক অনেক গোপন খবর ক্রমেই প্রকাশ হতে থাকবে, তা সে চাওজীর মহানুভবতা প্রকাশের ভাষায়ই হোক বা 'আবোল তাবোল'এর মূর্খজনের ভাষায়ই হোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

আসলে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে কে ছিলেন এবং কি করতেন সে বিষয়ে ভারতের লোকেরা খুব কমই খবর রাখত। তিনি কবে ব্যারিস্টারী পাশ করে ভাগ্য অন্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন বা সেখানে তাঁর পশার কিরকম হয়েছিল, সে খবর ত নয়ই। তবে শুনেছি সেকালের "Statesman" এবং 'Englishman"-এর মত দু'একখানি কাগজে নাকি তাঁর বিষয়ে মাঝে মাঝে খবর বের হত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নাকি টাকা রোজগার বাদেও অনেক কিছু করেছিলেন। আর তার ঐ অহিংসা মতবাদও তিনি ওখানে থাকতেই

আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতের রঙ্গমঞ্চে তাঁকে প্রথম দেখা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে এবং একজন সৈন্য সংগ্রাহী হিসাবেই। ইংরেজ জার্মান যুদ্ধে ইংরেজই যে ন্যায় পক্ষ তাতে কোন ভুল ছিলনা, ঠিক যেমন ছিল না তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ যে, যুদ্ধে জয় হলেই ইংরেজ ভারতকে তার প্রাপ্য স্বাধীনতা বুঝিয়ে দিয়ে অতি ভালমানুষের মত নিজের দেশে চলে যাবে। ইংরেজ জার্মানদের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা গিয়ে অংশ গ্রহণ করলেও, তাঁর অহিংসাতে সেদিন কোন দ্বিধা দেখা যায় নি। ঠিক যেমন আজকে তাঁর মানসপুত্র জহরলাল কথায় কথায় দেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেন না। তবে অহিংস তাঁরা দুজনেই, একজন ঐজন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রু ইংরেজের রক্তপাত পছন্দ করেন নি, আর অন্যজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেউ রক্তপাত করে এটা পছন্দ করেন না। গান্ধী নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকাকালে চৌরীচৌরা ক্ষেত্রে অধৈর্য জনগণ কিঞ্চিৎ শত্রু রক্তপাত করবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন এটা যেমন ঠিক গান্ধীসুলভ হয়েছিল, গোয়া ভারতের অংশমাত্র হলেও তার স্বাধীনতার জন্য জহরলাল কিছুই করবার ক্ষমতা রাখেন না, অথচ ভারতের অভ্যন্তরে গোয়া আন্দোলনের সমর্থকদের উপর গুলি চালাতে তাঁর কখনই কিছু অসুবিধা হয় না এটাও ঠিক জহরলালসুলভই বটে! তবে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম জীবনে 'বুয়োর' যুদ্ধে গান্ধীজী যে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে এম্বুলেন্স ভলান্টিয়ারের কাজ করেছিলেন এবং ঐ বাবদ ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা এবং পুরস্কারও পেয়েছিলেন, সে কথাটাও ভুললে চলবে না, কারণ তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপের মাঝেও ঐ ভলান্টিয়ারী মনোভাবের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করবার পুরস্কার হিসাবেই 'কাইজার-ই-হিন্দ' মেডেলও তিনি পেয়েছিলন ঐ ইংরেজদের কাছ থেকেই।

হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে এসেই গান্ধীজী যে কি করে অত

বিশাল ভারতবর্ষের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন সেটা বোঝবার মত বিদ্যেবুদ্ধি আমার আছে মনে করি না, আর কার যে আছে তাও জানা নেই। তিনি ত দেশে এসে ইংরেজের যুদ্ধ জয়ে যাহায্য করবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভারতের বিপ্লবী আর বিদ্রোহী ছেলেরা ইংরেজকে লাথি মেরে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য নিজেদের বুকের রক্তে ভারতের মাটি লাল করে তুলেছিল। এই রকম পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, কিভাবে যে গান্ধীজী বিশাল ভারতের নেতা হয়ে বসলেন, এটা বোঝা খুবই কঠিন। ইংরেজই কি তাঁকে এনে ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল? সেও কি সম্ভব? জানি না। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ভারতে আসবার পরও তাঁর কার্যকলাপ সমূহের প্রচার অন্তত প্রথম দিকটায়, ইংরেজ পরিচালিত কয়েকখানি ইংরেজী সংবাদপত্রেই বের হত। খাস ইংরেজদের দেশেও তাঁর বিষয় অনেক প্রচার কার্য চালান হত, যার ফলে রাজনীতির বাজারে তাঁর দর অনেকটাই উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি রাজনীতি করতে আরম্ভ করতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে যে স্পেশাল ট্রেন যোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত, সে ত সবারই খুব ভালভাবেই জানা আছে। এসব করেও তাঁর দর অনেক উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। অবশ্য ইঙ্গিত থাকলেও প্রমাণ এর চেয়ে বেশি দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়, তাই আমিও একথা বলতে চাইনা যে গান্ধীজীকে ইংরেজের দালালি করবার জন্যই ভারতে আনা হয়েছিল। হয়ত তিনি তাঁর নবলব্ধ অহিংসা-মন্ত্রের প্রচারকার্যের জন্য স্বেচ্ছায় ভারতে এসেছিলেন; ভারত ভূমিকেই তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র বিবেচনা করেই। তিনি যে বিবেচনায় ভুল করেন নি সে খুবই ঠিক কথা, আরও ঠিক কথা এই যে ইংরেজ তাদের কূট বুদ্ধির বলেই অতি সহজে বুঝতে পেরেছিল যে, বহুশত বৎসরের পরাধীন, ভগ্নমেরুদণ্ড এই জাতির সম্মুখে, আধা-ধর্ম আধা-রাজনীতি মার্কা এই অহিংসাবাদের মত একটা চীজ যদি ছাড়া যায় তাহলে তারা এটিকে লুফে নেবে এবং আপাতত তাদের উদ্দেশ্যও

খানিকটা হাসিল হবে। বাস্তবিক, সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েওছে।

ইংরেজ যে গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের নেশা দিয়ে ভারতের বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী আত্মাকে, ভারতের নবলব্ধ শক্তির চেতনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সে বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞেরও আমার সাথে মতের মিল আছে জানি। তবুও অনেককে বলতে অবশ্যই শুনেছি যে দুটো ভাঙ্গা পিস্তল আর দুচার ডজন হাতবোমা দিয়ে কখনও ইংরেজকে তাড়ান বা দেশে বিপ্লব আনা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। বিপ্লব আনতে হলে দেশের জনগণের মধ্যে জাগরণ আনা চাই। বোমা পিস্তল-ওয়ালাদের সাথে গণসংযোগ ছিল না মোটেই, তাই তাদের পথও ছিল অবাস্তব। তাদের মতে গান্ধীজীই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে গণসংযোগ করে সেই আন্দোলনকে সত্যিকারের বিপ্লবী পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রচুর পরিমাণে বোমা পিস্তলের অভাবটাই যদি গান্ধীজীর অহিংস রাজনীতির কারণ হত তাহলে অবশ্য বলার কিছুই থাকে না, কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসা যে ঐ অভাববশতই হয়েছিল না তাও খুবই পরিষ্কার। সেই জন্যই ঐ গণসংযোগের মুখরোচক কথাগুলোর বিশেষ কোন মানেও নেই। ওগুলো সবই অতি বাজে প্রপাগাণ্ডা বা অতি মিথ্যা প্রচারকার্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে, গান্ধীযুগের আগে ভারতে রাজনীতিতে কি কোন গণআন্দোলনের ব্যবস্থা ছিল না? ছিল। ১৯০৫ সালের আন্দোলন গণ-আন্দোলনই ছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অন্য আন্দোলনগুলোর চেয়ে বড় ছাড়া ছোট ছিল না। এই আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর নেতৃত্ব ত দূরের কথা তাঁর নামও কেউই শোনেনি, তিনি তখন এদেশেও ছিলেন না। ভারতের বিপ্লবীদের সাথে জনগণের সংযোগ যে ভালভাবেই ছিল তাও সে সময়ের সাহিত্য বা কবিতার ধারা দেখলেই খুব ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়। "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" এ গানটি নিশ্চয়ই শুধু বোমা পিস্তল-ওয়ালাদের জন্যই লেখা হয়েছিল না, বা তারাই শুধু এ গান গেয়ে বেড়াত না। বাংলা দেশের কোন হতভাগা যে

এ গান শোনেনি, আমি জানি না, আর কোন ক্লীবইবা ক্ষুদিরাম এবং অন্য শহীদদের ফাঁসির গল্প শুনে নিজেকে গর্বিত অনুভব করেনি সে খবরও আমার জানা নেই। গান্ধীওয়ালারাও সেরকম লোকের সন্ধান দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। জনগণের একান্ত সাহায্য এবং সহানুভূতিতেই ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাদের বাদ দিয়ে নয়।"

গান্ধীজীর চরিত্র সম্পর্কে লেখক যে প্রশ্ন তুলেছেন তার কথা ভাবতে ভাবতেই সত্যপ্রকাশের মনে পড়ে যায় সুভাষচন্দ্রকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' পদে বরণ করবার ঘটনা। সেই ঐতিহাসিক পত্রে চোখ বুলাতে থাকেন সত্যপ্রকাশ—

দেশনায়ক

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজ্যশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত, নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ-শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালে মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণ দেহ রোগের মত, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি, কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন, যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে

যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে উর্ধ্বে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণহস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলাম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চরিত্রশক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপনাকেই আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলবে—এই চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ; এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই—বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে—তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পার তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের দেশ নেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "যদি", কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেন না দেশকে বাঁচাতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো; সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে, সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে—জয়ে পরাজয়ে আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক—বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তাঁর অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্রসন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য। ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা মাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতঃ-উদ্যত ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কিনা এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মত তর্ক করেনি, বিচার করেনি—কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তাঁরা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পৃথক করে দিল বিপদ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণনিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চির-দিনের মতো প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক, তবু কি কালো করতে পেরেছে তার সেই অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠ তেজস্ক্রিয়তাকে?

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টিরূপ সৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের সমস্ত কিছু পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে দেশকে মুক্ত করে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব আজ গ্রহণ করো তুমি।

বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এ কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে আমাদের সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্‌বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে

আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে অনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই অগ্রগতির ষোড়শোপচার সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহ মনে তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক—কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৪৫

যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাস, সেই সুভাষচন্দ্রকে হরিপুরা কংগ্রেসে পরাজিত করবার জন্য গান্ধীজী মনোনীত করেছিলেন পট্টভি সীতারামিয়াকে।

ডক্টর সত্যপ্রকাশ স্বাধীনতার আবোল তাবোল নামক ইতিহাস গ্রন্থে লেখকের একস্থানে মন্তব্য দেখেছেন,—"সীতারামিয়ার হার মানেই আমার হার" একথা গান্ধীজী নিজ মুখেই বলেছিলেন কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই দেশের লোক সুভাষবাবুকেই ভোট দিলেন তখন

গান্ধীজীকে নেতৃত্ব ছেড়ে সরে দাঁড়াতে দেখা গেল না। সোজা পথ ছেড়ে তখন তিনি বাঁকা পথ ধরলেন এবং সেই চোরাগুপ্তির পথেই ত্রিপুরীতে সুভাষবাবুকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লেন। যে গান্ধীজী শত্রু ইংরেজের দুঃসময়েও সুযোগ নিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে চাননি, সেই গান্ধীজীরই সুভাষবাবুর সঙ্গে এই ব্যবহার সামঞ্জস্যবিহীন মনে করলে আমাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করবার লোকেরও হয়তো অভাব হবে না।

সত্যপ্রকাশ একটি পত্রিকা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে সুভাষচন্দ্র জয়ী হোক এই ইচ্ছা ছিল তার পক্ষে যুক্তিনির্ভর তথ্যটি বের করে তাতে চোখ বুলাতে লাগলেন—"সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হলে কংগ্রেস থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে এলেন। এ ঘটনা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার করুণ কাহিনী নয়, এ ঘটনা সেদিন বাঙালী জাতির বুকে তীব্র অপমান এবং দুঃখের আঘাত হেনেছিল। এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর এই অবরুদ্ধ ক্ষোভকে ভাষা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রবীণ এবং নবীন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব যেখানে দেখা দিয়েছে সেখানে সুভাষচন্দ্রই নবীনের নেতৃত্ব করবার যোগ্যতম ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ তা চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅনিলকুমার চন্দ শ্রীজহরলাল নেহেরুকে যে পত্র লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। যেদিন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৯) সেদিনই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।"

ডক্টর সত্যপ্রকাশের মনে হয় যে-গান্ধীজী মহাত্মা রূপে [illegible] সরকারীভাবে যিনি জাতির পিতা রূপে চিহ্নিত তাঁর চরিত্রের সত্য রক্ষায় এমন বিচ্যুতি ? তবে ভারতীয় উপমহাদেশে [illegible] স্বাধীনতা আন্দোলন রূপ ব্যাপারটায় সত্যের বিরুদ্ধেই কি করা হয়েছে সংগ্রাম ? আর এই জন্যই কি আজ সমাজে, শাসনে, রাজনীতিতে

প্রশাসনে সম্ভব হচ্ছে "সত্যমেব জয়তে" নয়—অসত্যের জয়, অনাচারের আদর এবং দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য বা মাৎস্যন্যায়!

এ জিনিষ কি চলতো দেশে সুভাষচন্দ্রের রাজত্ব কায়েম হলে? চলত কি দেশে দুর্বলের উপর সবলের জুলুমবাজি? বৃহৎ গ্রাস করত ক্ষুদ্রকে? ধনী নির্ধনের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তুলতো অর্থলিপ্সায়? রুচির উপর প্রাধান্য করত কুরুচি? শ্লীলতাকে ধর্ষিত করত অশ্লীলতা? চলত কি দেশে মদ্যপান, রেস, জুয়া, ক্যাবারে, মস্তানীজম্? চলত কি দেশে শিল্পের স্বাধীনতার নামে অসংযমের, ব্যভিচারের, মূল্যবোধহীনতার অবাধ বন্যা? যে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যুবচরিত্র গঠনে ব্রহ্মচর্য অনুসরণের উপর দিয়েছেন তাঁর নানা বাণীতে সর্বাধিক গুরুত্ব সেই বিবেকানন্দর ভাবশিষ্য হিসাবে সুভাষচন্দ্রের শাসনে কি এসব চলা সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে সত্যপ্রকাশ আর একটি পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতে লাগলেন—

ত্রিপুরী কংগ্রেস : সুভাষচন্দ্র : এম. কে. গান্ধী : বাঙালীর নেতৃত্ব

যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রগুরু, যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা ও অনুধ্যান থেকেই হয়েছে আধুনিক কংগ্রেসের জন্ম, সেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আফ্রিকা ফেরৎ বিফল ব্যারিস্টার গান্ধীজীর [illegible] সাক্ষাতে সময় লেগেছিল বেশ কিছুটা। দীর্ঘ সময় এম. কে. [illegible] সুরেন্দ্রনাথের দর্শন পেতে প্রতীক্ষা করতে হয়। কালে এই [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল প্ল্যান বাঙালীর দ্বারাই সমাধা করান হয়েছিল। বাঙলায় যেমন জন্মলাভ করে মহারাজ নন্দকুমার, বাঙলায় তেমনি জন্মলাভ করে মীর্জাফর, রাজা রাজবল্লভের দল।

হরিপুরা কংগ্রেসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া যখন বাঙালী সুভাষচন্দ্রের কাছে হেরে গেলেন, তখন গান্ধীজী বুক চাপড়ে স্বীকার করলেন যে তাঁর পরাজয় হল, তবু কিন্তু সুভাষচন্দ্র সভাপতির গদী ধরে থাকতে পারলেন না। এ ব্যাপারে কোন কোন বাঙালী কংগ্রেসের কোন্ গ্রুপের হয়ে কাজ করেছিল তা ইতিহাসের ছাত্রদের অজানা নেই।

সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে একদল গা সোঁকা বাঙালী সব সময়ই রয়ে গেছে যারা বাঙলা মায়ের কুসন্তান রূপে পরিগণিত হতে পারে। এই সকল বাঙালী রাজনীতিকরা কখনও বুঝতে চায় না যে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দী ভাষী গ্রুপ বাঙালীকে বঞ্চিত করে স্বাধীনতার লাড্ডু ভক্ষণের কী গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই ষড়যন্ত্রেরই প্রকাশ দেখা যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঐ নাটকীয় ঘটনায়—যে ঘটনায় মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতের নেতৃত্ব-বেদী থেকে বাঙালীকে ঠেলে দেবার প্রথম প্রয়াস হয় ত্রিপুরী কংগ্রেসে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগের পর আর কোন বাঙালী নেতা কংগ্রেসে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি—যে কিনা স্বাধীনতা অর্জনকালে বাঙালীর স্বার্থ দেখতে পারে।

পরবর্তীকালে বহু ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে গান্ধীজীর শিষ্য জহরলাল বাঙালী বিদ্বেষী। বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা অর্জন কালে বাঙলা ব্যবচ্ছেদ এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এর পর ১৯৪৯ সালে রাজভবনে এক প্রেস কনফারেন্সে যখন সাংবাদিকরা জহরলালকে প্রশ্ন মারফৎ চেপে ধরে জানতে চায় যে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে যদি লোক বিনিময় সম্ভব হয়ে থাকে তবে কেন তা সম্ভব নয় বাংলার ক্ষেত্রে, তখন সেই প্রশ্নের যথাযথ কোন উত্তর তিনি দেন নি। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে তাতে ভারতের সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ হবে, প্রশ্ন করলে হাস্যপরিহাস করে তিনি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন ।

এই উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে বাংলাদেশে লোকবিনিময় হলে বাংলার সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে যে স্থিতিশীলতা আসত, তেমন স্থিতিশীলতা চায় নি ভারতের নেতৃবৃন্দ। উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করে বাঙালীকে ইহুদীদের মত চির ভিক্ষুকে (তবে এখন ইহুদীরাও তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র পেয়েছে) পরিণত করার একটা কুটিল প্ল্যান তলে তলে সমাধা করে নিয়েছিলেন তাঁরা। বাঙালীকে, তার বিদ্রোহী মনোভাবকে বিশ্বাস যেমন করেনি বৃটিশ, তেমনি করেনি গান্ধীজীর নেহেরু প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ। এই কারণে বাঙলার বুকে বাঙালীর বুকে স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে রেখে, বাঙালীকে ছন্নছাড়া গৃহহারা করে তার শক্তি উপাসনারূপ আত্মার অবমাননা করার চেষ্টা হয়েছে।

এ প্ল্যান যদি না করা থাকত তবে গান্ধীজী তাঁর শিষ্যরূপে জহরলালের পরিবর্তে সুভাষচন্দ্রকে মনোনীত করতে পারতেন। কিন্তু বাঙালী ভারতের প্রশাসনিক নেতৃত্বে আসুক—এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। যে সময় সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল পাশাপাশি, তখন দৃষ্টি জ্ঞানসম্পন্ন সকল মানুষই দেখেছেন যে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতায়, সাংগঠনিক বিচক্ষণতায় সুভাষচন্দ্রের তেজ ও জ্যোতি নেহেরুর চেয়ে অনেক অনেক বেশী দেদীপ্যমান। এ সত্ত্বেও যে সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী সমর্থন করলেন না এবং প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করলেন—এর দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর পরাজয়ে যারা সহায়তা করল তাদের স্থান কংগ্রেসে হবে না। কেননা কংগ্রেস তখন পুরোপুরিভাবে গান্ধী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত।

গান্ধীজীর ঐ খেদোক্তি সুভাষচন্দ্রকে প্ররোচিত করল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন না করতে। ফলে সুভাষচন্দ্র বিদায় নিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অর্থাৎ বাঙালীর রাজনৈতিক মণীষা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে লাথি মেরে চলে এলো।

এ বিষয়ে পাঠকগণ নিশ্চয়ই মানেন যে, যে সকল মানুষের মধ্যে

—সে রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সেবা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন—বস্তু কিছু থাকে, থাকে নিষ্ঠা, তাঁরা কিছুটা অভিমানী হয়ে থাকে। আত্মপ্রত্যয়ই তাঁদের অভিমানী করে, আত্মমর্যাদা দান করে।

গান্ধীজীর ঐ উক্তি সুভাষচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ না করে পারে না। তাঁর মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে যোগ্যতাবলে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে যাবে গান্ধী কংগ্রেস। এ অবস্থায় নিজের পরিকল্পনা মত কোন কাজই করা সম্ভব হবে না। এই কথা ভেবেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকে জানা যায় যে তখনকার দিনের বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে কংগ্রেসের কোন নেতারই তেমন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু যে কোন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হলে সে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এ কথা ভেবেই সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসে গান্ধী-গ্রুপের মত গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে হয়তো গদী বাঁচানো যাবে, কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম পরিচালিত করা যাবে না।

এই কথা ভেবে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এ কথা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট যে গদীর লোভ কোন সময়ই ছিল না সুভাষচন্দ্রের। যদি থাকত তবে তিনি কখনই কংগ্রেস সভাপতির আসন ছাড়তেন না।......

বাঙালীর নেতৃত্ব অস্বীকার করার পর স্বাধীনতা যখন পড়েই পাওয়া গেল মাউন্টব্যাটেনের ভোজবাজীতে, তখন বাঙালীর মাথায় লাঠি মারা হল বাঙলা ভাগ করে। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক চেতনার ওপর মহম্মদ জিন্নারও এমন আস্থা ছিল যে বাঙলা ভাগের প্রস্তাব শুনে তিনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন How is it possible ?

কিন্তু জহরলাল প্রমুখ গান্ধী-শিষ্যরা সাত কোটি বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করার এ প্ল্যান লুফে নিয়ে বাঙালীকে চিরদিনের

মত বঞ্চিত করল ভারতের নেতৃত্ব থেকে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাঙালীর বিরুদ্ধে পত্তন করা হয়েছিল যে ষড়যন্ত্র তা সমাধা-করা হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙলাকে খণ্ডন করে, বাঙলাকে ভঙ্গ করে। ইতিহাসের কি কুটিল গতি! ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিল অবশিষ্ট ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে, সেই বাঙলার বুকে ছুরি চালিয়ে বাঙলার মাথায় উদ্বাস্তু সমস্যার লাঠি মেরে স্বাধীনতার মোয়া পেল দিল্লী। সে 'দিল্লী-কা-লাড্ডু' যারা খেয়েছে তারাও পস্তাচ্ছে আবার যারা খায়নি (পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙালী) তারাও পস্তাচ্ছে। আরও কতদিন এই পস্তানো চলবে কে জানে? (—এসবি)

ডাক থেকে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' বইটা নিয়ে তাতে দৃষ্টিপাত করেন ডক্টর সত্যপ্রকাশ—

নেতাজী—নেতাজীই

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ। এই মহান নেতার সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। এই বিরাট পুরুষের জীবনের প্রতিটি কর্মের পিছনে আছে ভারতবর্ষ ও তার নিপীড়িত জনগণের প্রতি অসীম মমত্ববোধ। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এই অমিত বীর্যশালী, দৃঢ়চেতা পুরুষ সিংহের স্মরণ—আমাদের একান্ত কর্তব্য।

১৯৪৩ সালের ২১-এ অক্টোবর স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার পরে ভারতবর্ষ নূতন দৃশ্য দেখিল, এক নূতন সঙ্গীত শুনিল, এক নূতন প্রেরণায় উঠিয়া জয় ধ্বনি করিয়া গাহিল "জয় হিন্দ্!"

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। প্রতিপক্ষ প্রবল, প্রভূত পরাক্রমশালী, ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল সহস্রগুণ অধিক। ..তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ অতীব নগণ্য।...কিন্তু সুভাষ বোসের হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দেখিয়াই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে ; জাপানী হাত গুটাইয়াছে।...আজাদীর কিছু নাই, তবু সব আছে। কেননা তাহারা জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনের ব্রত ধারণ করিয়াছে।...

সুভাষ বলিয়াছিলেন, তোমরা দেহের শোণিত দাও, আমি ভারতের স্বাধীনতা দিব।...নেতাজী বলিয়াছেন শোণিত দিতে হইবে ; তাহারা শোণিত দিতে চলিয়াছে।...নেতাজী বলিয়াছেন, স্বাধীনতা আসিবে, তাহারা স্থির বিশ্বাসে বুঝিয়াছে স্বাধীনতা আসিবে।... তাহারা জন্মভূমির মাতৃভূমির বন্ধন মোচন করিতে আজ উদ্যত ......তাহারা জানিয়াছে শোণিত মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে হইবে।

...সুভাষচন্দ্র চিরদিনই বিরামহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী...১৯৪০ সালে রামগড়ে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন কংগ্রেসের মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র রামগড়ের সন্নিকটে আপোষ বিরোধী সম্মেলন আহুত করিয়াছিলেন।

মালয়ে সিঙ্গাপুরে অথবা ব্রহ্মের যুদ্ধে বৃটিশ-আমেরিকান সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের আশা অত্যন্ত কম জানিয়াও সুভাষচন্দ্র সংগ্রামে বিরত হন নাই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাঁহার ভারতীয় বাহিনীকে নিরস্ত করেন নাই ; নিজেও যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে চাহেন নাই।

সুভাষ গঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রে, নারীও পুরুষের সহিত সমমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঝান্সীর রানী বাহিনীর নেত্রী লক্ষ্মী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পরিচালিকা। নব্য-ভারতের স্রষ্টা, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে নারীর দাবী অস্বীকার করিলে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ হইত।

...সমগ্র এশিয়ার যিনি জাগ্রত নব-জীবনের, নবীন ও দুরাগত

জগতের গান শুনাইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত রাষ্ট্রতন্ত্র পক্ষপাতমূলক বা একদেশদর্শী হইতে পারে না।

সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি কার্যে আমরা সেই বিপ্লবী সাধু বিবেকানন্দের বাণী প্রতিধ্বনিত শুনি।

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—
আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।
মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী,
চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

"তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী,—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল—দিন রাত বল—

হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে

আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

সুভাষের আত্মজীবনী কি ঐ মন্ত্রের উপরেই অধিষ্ঠিত নহে ?

হায়, কয়জন ভারতবাসী স্বামীজীর মত কম্বুকণ্ঠে বলিতে পারে যে 'ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ?'

সুভাষচন্দ্র পারিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র আত্মবলি দিয়া বলির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুভাষের মত "জয় মা" বলিয়া আত্ম-বলি দিতে কে পারিয়াছে ?...

একদিনের জন্য হোক, অথবা এক সপ্তাহের জন্য হোক, কিম্বা এক মাস বা এক বৎসরের জন্য হোক, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার যিনি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনা বিফল এবং বিফলতায় হিমালয় প্রমাণ হইলেও, ভারতবাসীর আজাদী আকাঙ্খানলে সে যে পূর্ণমাত্রায় আহুতি দিয়া গিয়াছে, বৃটিশ যদ্যপি তাহা না বুঝিয়া থাকে তাহা হইলে বৃটিশের রাজনৈতিক বুদ্ধির

ভাণ্ডারে গোময়াতিরিক্ত পদার্থ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে।

একি কম গর্বের কথা যে ভারতবর্ষের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিয়াছিল? একি অল্প গৌরবের কথা যে ভারতবাসী বিদেশীর সম্পর্ক ছেদন করিয়া বিদেশীর রাজ্যে স্বকীয় শাসন প্রবর্তিত করিয়াছিল? মণিপুরে তাহার পতাকা, ইম্ফলে তাহার পতাকা, কোহিমায় তাহার পতাকা, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাহার সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীন থাকিয়া বিশ্ব-সভায় ভারতের গৌরব, ভারতের মর্যাদা ও সম্মান প্রচারিত করিল।

বৃটিশ বিনাশ বা বৃটিশের বিলোপ সাধন জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পবিত্র ব্রত হিসাবে সুভাষচন্দ্র গণ্য করিয়াছিলেন। শত্রু বিনাশে বল, ছল, কল ও কৌশল সমস্তই প্রযোজ্য, সর্বদেশে সর্বকালে ও সর্বসমাজে বিধান আছে। সুভাষ সেই বিধানানুযায়ী কাজ করিয়াছেন।

বৃটিশ জাতির পুরুষ বা নারী আসিয়া ঘর ঝাট দেয়, জামা কাপড় কাচে, জুতা বুরুশ করে দেখিয়া সুভাষের বড় আনন্দ। অন্তরে সুখের সুচনা হইয়াছিল—তাহার পরিচয় বিলাত হইতে লিখিত (কোন বন্ধুকে) একখানি পত্রের একটি ছত্রে অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়, "ইংরেজ আমার জুতা সাফ করিতেছে, যখনই দেখি আমার আনন্দ হয়।"

বিংশ শতাব্দীতে, অস্ত্রশিক্ষাহীন, শস্ত্রবলহীন দুর্বল ভারতবাসী ভারতেরই সীমাভ্যন্তরে বৃটিশের রাজ্যের ভিতরে বিতাড়িত বৃটিশের রাজ্যখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিল, এমন লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া ধন্য হওয়ার আগ্রহও যেমন স্বাভাবিক, পাঠক-পাঠিকার ধন্য হওয়াও তেমনই স্বাভাবিক।

সেই প্রিয় পরিচিত লোকটি একদিন আমাকে ভাই, আমার

মা'কে মা বলিয়া ডাকিত, আমার ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া আহ্বান দিত, সেই লোকটি। ...আমার জন্মভূমির দুঃখে তাহার নয়নে দরবিগলিত ধারা। আমার ভারতের বন্ধনমোচনের জন্য সারাজীবন সে দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করে; সারাজীবন কারাবাস করে। দারিদ্রকে মাথার মণি করিয়াছে ও দৈন্য তাহার চিরসাথী। সম্পদকে হেলায় বিসর্জন দিয়াছে, বিপদ তাহার পথের পথিক। ...সেই লোক একালে, এই পরাধীন দেশে, বিশ্বের অবজ্ঞাত দাসানুদাস জাতির মধ্যে উদ্ভুত হইল যেদিন সেদিন প্রভাতের অরুণ রাগরঞ্জিত ভারতের বিস্ময়বিমুগ্ধ নরনারীর স্তম্ভিতস্তব্ধনয়ন সমক্ষে বিরাট বিশাল হিমাচল সদৃশ্য মূর্তিতে প্রতিভাত হইল।

সুভাষ আই-সি-এস'এর স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন সকলেই জানেন, কিন্তু কেন করিয়াছিলেন? এই পত্রখানি কেমব্রিজ, কিট্জ উইলিয়াম হল হইতে লিখিত হইয়াছিল।

"আজ কর্তব্যের আহ্বানে I. C. S. চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছি। আমাদের একটা বই পড়িতে হইত তাহাতে আছে "Indian Sayce is dishonest". আমি ঐ sentence সম্বন্ধে আপত্তি উথাপন করি, কারণ ঐ sentence পড়িয়া পাঠকের মনে ধারণা হইবে যেন ভারতবাসীরা dishonest. কর্তৃপক্ষ next edition-এ কথাটা তুলিয়া দিবেন বলেন। আমি বলি যে যখন জিনিষটা অন্যায়, আমি ঐ লাইন পড়িব না। কর্তৃপক্ষ বলেন, না তোমায় পড়িতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "আমি তাহা হইলে এই মুহূর্তে চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম।"

জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, তাহাকেই আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি বলিয়া মান্য করিতে পারি। এই চুক্তির কয়েকটি সর্ত......স্মরণযোগ্যও বটে।

(১) জার্মান গভর্ণমেণ্ট সানন্দে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘকে ভারতীয়গণ পরিচালিত ভারতবর্ষের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করিলেন।

(২) উভয় প্রতিষ্ঠানেরই একমাত্র উদ্দেশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন।

(৩) রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যে যুদ্ধ, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

(৪) জার্মান গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ সঙ্ঘকে মাসে মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্জ দিতে সম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধান্তে এই অর্থ এককালীন অথবা সুবিধামত কিস্তিতে পরিশোধনীয়।

সর্তগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতির উপরই দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র তখন হইতেই, সেই বিদেশে…স্বাধীন ভারতের কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ সেক্রেটারিয়েট নেতাজীর সৃষ্টি, তিনিই ইহার প্রথম পরিচালক। কৃষি গবেষণাগারে ঢুকিয়া দেখা গিয়াছে যে নেতাজী সেখানেও কর্মে নিরত, শিল্প সংগঠনাগারেও নেতাজী। প্ল্যানিং—পরিকল্পনা বিভাগটিও তাঁহার প্রাণপুত্তলি। রেডিওর কোন্ ভাষায় কোন দিন কোন বিষয় কথকতা হইবে তাহারও নির্দেশ নেতাজী দিতেন। মাসিক পত্রের লেখা নির্বাচনেও নেতাজীর আগ্রহের অভাব ছিল না।

জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র সৈন্য শিক্ষা শিবিরটিকে আধুনিকতম শিক্ষাশিবিরে রূপান্তরিত করিলেন।…

সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

"ভারতবর্ষ ও ভারতের আটত্রিশ কোটি নর নারীর স্বাধীনতা অর্জনের যে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে সেই পবিত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি সুভাষচন্দ্র বসু জগদীশ্বরের নামে অঙ্গীকার করিতেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাতে যথাসম্ভব সহায়তা করিতে বিরত হইব না।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ওয়ারলর্ড হইলেও বেসামরিক গভর্ণমেণ্টএরও তিনিই সর্বনিয়ন্তা। সমরবিভাগ এবং বেসামরিক বিভাগ দুই সুবৃহৎ বিভাগের কার্য পরিচালনার ভার তাঁহারই ওপর। এই সময়ে তিনি যে অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিরল··

রাষ্ট্রে মুদ্রার একটি বিশেষ প্রভাব আছে, যাহার মুদ্রা তাহারই প্রাধান্য। সেই জন্যই নেতাজী নিজস্ব কারেন্সী প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।···

আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের অনেকগুলি বড় বড় সহরে এবং ভারতের স্বাধীন মণিপুর অঞ্চলে আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের যে স্থান, আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্টে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কেরও স্থান তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

নেতাজীর নির্দেশ এই যে আজাদ হিন্দ সরকার দরিদ্র ভারত-বর্ষীয়দের রাষ্ট্র। তাঁহাদের ধন সম্পদ নাই। শোষণ করিবার মত জমিদারী নাই, শোষণ করিবার প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের মুক্তি কামনাই এই সরকারের মূলধন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সর্বাধিনায়ক হইতে পদাতিক পর্যন্ত সকলেরই কাম্য। এই গভর্ণমেণ্টে সকলেই এক।

এক স্থান হইতে শিবির অন্য স্থানে যাইতেছে অথবা একদল কর্মচারীর বদলীর আদেশ হইয়াছে তাহারা ট্রেনে উঠিবে কিংবা নৌকায় চড়িবে, অকস্মাৎ অদ্ভুত দৃশ্য! নেতাজী সেইখানে স্বয়ং উপস্থিত। প্রত্যেকটি লোকের শারীরিক কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহার কিটব্যাগ পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে কে কবে কোন্ সর্বাধিনায়ককে দেখিয়াছে?

···নেতাজী বলিতেন, আমিও আমার মাতৃভূমি উদ্ধার করিতে চলিয়াছি। মাইনার-স্যাপার যে, সেও তাহার মাতৃভূমি উদ্ধার করিতে

চলিয়াছে। ওর ও আমার উদ্দেশ্যে যখন কোন বিভিন্নতাই নাই, তখন পোষাকে বা আহারেই বা বিভিন্নতা থাকিবে কেন? কর্মকর্তাদের ডাকিয়া গোপনে বলিতেন, ভাই সকলকে সমান দেখিও।

আশ্চর্য নহে যে, পিতা পুত্রকে যেমন, মা সন্তানকে যেমন গুরু শিষ্যকে যেমন ভালোবাসেন, পুত্র পিতাকে, সন্তান জননীকে, শিষ্য গুরুকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, বন্ধু বন্ধুকে, সখী সখীকে, প্রেমিক প্রণয়িনীকে যেরূপ প্রীতি করিয়া থাকেন, আজাদ হিন্দ সরকারের মানুষ মানুষী নেতাজীকে ভালোবাসিয়া, ভক্তি কয়িয়া, প্রীতির প্রেম সিংহাসনে বসাইয়া অন্তরের কোমল ও উচ্চবৃত্তি নিচয়ের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। এক নেতাজীর মধ্যেই তাহারা পূজার প্রেমের ও প্রীতির অবদানের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছিল।

বাঙালী সুভাষচন্দ্রকে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব থেকে সুকৌশলে সরিয়ে দেবার বিষয়টা আলোড়ন সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের মনে; স্মৃতিতে ভেসে ওঠে নেতাজীর অগ্রজ শরৎ বসুর মূর্তি। ১৯৪৮ সালেই তিনি কোন সময়ে বিহারের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল দাবি করেছিলেন। কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর প্রতি ইংরেজ আমল থেকেই চলছে এই অবিচার। তাক থেকে 'বাঙালী' বইটি টেনে নিয়ে তাতে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন—

বাঙলার সীমানা

ইংরেজ আমলে ১৭৬৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা এক সঙ্গে ছিল, ১৮২৭ সালে এদের সঙ্গে জুড়ে গেল আসাম, আবার আলাদা হল ১৮৭৪ সালে। এই চারিটি প্রদেশের পরস্পর সম্পর্ক প্রাক্-ইংরেজ যুগেও ছিল, এদের অর্থ নৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। এই প্রদেশগুলির সীমানা কিন্তু আজো কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়নি। ইংরেজের রাজত্বে

সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে নানা কারণে, বিশেষত বিভেদনীতির তাগিদে। বাঙলার নানা এলাকা নানা ভাবে বিহার ও আসামের সংগে যুক্ত করা হয়েছে বাঙালীর দ্রুত বর্ধমান শক্তিকে খর্ব করবার জন্য ও প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে ভাঙনের বীজ বপন করবার উদ্দেশ্যে।

আসাম যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল তখন সে নিয়ে গেল কাছাড় ও শ্রীহট্ট, কিন্তু কাছাড়ের ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ ও খাঁটি অসমীয়ার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। শ্রীহট্টের ২৮ লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ অসমীয়ার সংখ্যা ২ হাজার। আসাম উপত্যকাতেও বিশেষত গোয়ালপাড়া ও নওগাঁতে, বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রবল। সমস্ত আসাম প্রদেশেই অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যা বাংলাভাষী-দের অর্ধেক। অবশ্য বর্তমানে শ্রীহট্ট অনেকটাই পূর্বপাকিস্তানে চলে গেছে। শ্রীহট্টের অবশিষ্ট অংশ, কাছাড়, ত্রিপুরা ও মণিপুর নিয়ে পূর্বাঞ্চল প্রদেশ (প্রায় ১৫,০০০ বঃ মাইল) অনায়াসেই গঠন করা যেত, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি কংগ্রেস সরকারের আপত্তিতে।

১৯১২ সালে বাংলার কয়েকটি অঞ্চল বিহারে চলে যায় অনেক আপত্তি সত্ত্বেও। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের ২৯০ ধারায় আবার যুক্ত করবার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু তখন কোন চেষ্টা হয়নি নানা কারণে। মানভূম জেলা এবং সিংভূম জেলার ধলভূম অঞ্চলেই বাংলার দাবী সবচেয়ে বেশী—মোট ৫,৩০০ বর্গ মাইল জায়গায়। মানভূমের লোক সংখ্যা সাড়ে কুড়ি লক্ষ; তার মধ্যে বাঙালী সাড়ে বারো লক্ষ, হিন্দী ভাষী সাড়ে তিন লক্ষ, বাকি আদিবাসী। ধলভূমে বাঙালী শতকরা ৫৭ জন, জামসেদপুর বাদ দিলে, শতকরা ৬২ জন। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ অঞ্চলে গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতের ভিত্তিতে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৯৭ জন, কিন্তু এই অঞ্চলের ওপরে বাংলার দাবি দুর্বল করবার জন্য

ব্রিটিশ সরকারের আদেশে ১৯২১-এর লোক সংখ্যা গণনায় কিষণ-গঞ্জিয়া ভাষাকে হিন্দী ভাষা হিসাবেই ধরা হয় এবং তার ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা কমে ৬ লক্ষ।

এ ছাড়া সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি এলাকায়ও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি রয়েছে। পূর্ব বিহারের আদিবাসীদের সংগে বাঙালীদের সম্পর্ক বিহারীদের চেয়ে বেশী, বাংলা ভাষার প্রচলনও। তা ছাড়া সমাজবিন্যাস আচার প্রথা সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আসাম ও বিহারের অঞ্চলগুলি বাংলায় যুক্ত হবার দাবী রাখে। শেরাইকেল্লা খরসোয়ান ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্যগুলির কয়েকটি অংশও বাংলায় যুক্ত হতে পারত। কিন্তু শেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানকে উড়িষ্যার সঙ্গে যোগ করেও কংগ্রেস সরকার পরে তুটিকে অযৌক্তিক ভাবে বিহারের সংগে জুড়ে দিয়েছেন। অতঃকিম্ !

অথচ একাধিকবার কংগ্রেস বলেছেন যে ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশের সৃষ্টি বা সীমানা নির্ধারণ হবে। তা ছাড়া অনেক দিন থেকেই বিহার ও আসামে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙালীরা সুবিচার পাচ্ছে না। তাদের দাবি দুর্বল করবার জন্য হিন্দী ও অসমীয়া ভাষার প্রচারকার্য প্রাদেশিক সরকার নির্বিকারে চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষতঃ বিহার সরকার আন্দোলন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানারকম অবিচার ও অত্যাচারও করেছেন। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশ গঠনের তোড়জোড় চলেছে কিন্তু বাংলার দাবি সম্বন্ধেই কংগ্রেসী নেতাদের যত ঔদাসীন্য ও বিরোধিতা। খনিজ সম্পদের অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি পৃথক শিল্প-কেন্দ্রীয় প্রদেশ গঠন করবার প্রস্তাব হয়েছে এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি হচ্ছে ধনপতিদের স্বার্থরক্ষার চক্রান্ত; এতে বাংলা ও বিহারের জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'বিহার-বঙ্গ' নামে একটি যুক্ত প্রদেশ গঠন করার কথাও উঠেছিল। কিন্তু এ সমস্ত প্রস্তাবই আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল দাবি অনস্বীকার্য। পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দুরা দলে দলে

আসতে শুরু করেছে। ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান লোকসংখ্যার উপযোগী স্থান ও সম্পদ নেই। অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তাই শুধু বাংলা নয় সারা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। নানা কারণে বাঙলায় কংগ্রেসী প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে এর জন্য কংগ্রেসী নীতি ও কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই দায়ী। বাঙালীর মনে তাই এ ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে ঈর্ষা ও প্রাদেশিকতা ছাড়াও অন্য কারণ আছে; বাঙলার কংগ্রেস বিরোধিতার জন্যই তার আঞ্চলিক দাবিকে অবহেলা করা হচ্ছে।

বাঙলার যে দুটি দেশীয় রাজ্য রয়েছে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার আর কোন অর্থই হয় না। কুচবিহার (১৩১৮ বর্গমাইল) ও ত্রিপুরা (৪২১৬ বর্গমাইল) এ দুটিরই বাংলার সঙ্গে মিলে যাওয়া উচিত। বর্তমানে ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগ নেই; পূর্বাঞ্চল প্রদেশ হলে এ সমস্যার সমাধান হত এবং পাকিস্তান সীমানার হাংগামাও কমত।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে। ২৫০০ বর্গ মাইলের এই দ্বীপপুঞ্জ বাঙলার সংগে যুক্ত হতে পারে। এখানকার অরণ্যভূমি এত দিন বন্দীদের আবাস হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে বাঙলার উদ্বাস্তু জনগণের বসতি হতে পারে। এর বন্দর এবং কৃষিজদ্রব্য ও অরণ্য সম্পদ বাঙালী ঔপনিবেশিকদের পক্ষে মূল্যবান হবে। বাঙালীর ঔপনিবেশিক বসতি আন্দামানে আরম্ভ হয়েছে।

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

১৯০৫-এর বঙ্গ বিভাগ এনেছিল জাতীয়তাবোধ ও সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা; ১৯৪৭-এর বঙ্গ বিভাগ আনল জাতীয়তার অপমৃত্যু ও সারাভারতের ভবিষ্যৎ অবনতির সম্ভাবনা। ১৯০৫-এর বঙ্গ বিভাগের মূলে একটা ভৌগোলিক ভিত্তি ছিল; ১৯৪৭-এর বঙ্গ

বিভাগের মূলে রয়েছে মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের কয়েকদিন পরেই র‍্যাডক্লিফের আজব বিবরণী বেরোল। যারা একদিন বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে গিয়ে সারা ভারতের জাতীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল তারাই চাইল বাংলাভাগ—ইতিহাসের উপহাস। "স্বাধীন বঙ্গ" আন্দোলনে কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের দুই বাংলা সত্যিই অপরূপ সৃষ্টি। যে কোন স্কুলের ছাত্রও এমন একটা অযৌক্তিক ব্যাপার করতে পারত না। তা হলে র‍্যাডক্লিফ করলেন কেন? যুক্তি করেই, যুক্তিটা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীর। দুটি বাংলাকেই দুর্বল অচল সমস্যাজর্জর করে দেওয়া চাই, আর তার সংগে ভারত ও পাকিস্তানকেও।

১৯০৫-এর দুটি বাংলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সীমানা ছিল; র‍্যাডক্লিফ দুটি রাষ্ট্রের মাঝে কোন সীমানা রাখলেন না বিবাদ বাধাবার জন্য। তিনি হিন্দু প্রধান খুলনাকে দিলেন পাকিস্তানে আর মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদকে টানলেন পশ্চিমবংগে, যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না মেটে। পশ্চিমবংগের উত্তর ও দক্ষিণে কোন সম্পর্ক রইল না, যাতে পরে বাঙালী ও অবাঙালীর মধ্যে বিরোধের সুবিধা হয়। পনেরোই আগস্ট খুলনা আর মুর্শিদাবাদ পতাকা তুলল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, তার পরে ঘটল পতাকা-বিভ্রাট। সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে র‍্যাডক্লিফ জলপাইগুড়ি থেকে একটু দিলেন পূর্ব-বঙ্গে আর যশোর থেকে কাটলেন পশ্চিমবংগে। দিনাজপুরের খানিকটা, নদীয়ার খানিকটা আর গোটা মালদহটাই দিয়ে ফেললেন পশ্চিমবংগকে আর এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে মুসলমানহীন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঠেলে দিলেন পূর্ববঙ্গে! বিভাগের ব্যবস্থা করে দেশে গিয়ে র‍্যাডক্লিফ কলকাতায় ইংরেজের স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর ব্যবস্থায় কেউ খুশী হল না, বোঝা গেল তাহলে সুবিচার হয়েছে!

সুবিচারের ফলে পূর্ববঙ্গের আয়তন হল পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইল, পশ্চিমবংগের হল আটাশ হাজারের কিছু বেশী। পূর্ববংগে ১৯৪১-এর

লোক সংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি আর পশ্চিমবংগে প্রায় সওয়া দুই কোটি। সংখ্যা বৃদ্ধি তো হয়েছেই উপরন্তু স্থানান্তরের ফলে সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যায় তুচ্ছ নয়, পশ্চিমবংগে মুসলমানরাও নয়। তাহলে বিভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হল কোথায়? পূর্বংগ কৃষিপ্রধান, পশ্চিমবংগ শিল্প প্রধান! পূর্ববঙ্গে পাট, অনেকটা ধান, খানিকটা চা, পশ্চিমবংগে রইল সমস্ত খনিজ সম্পদ, প্রায় সমস্ত কলকারখানা ও মিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা, শাসনযন্ত্রের কাঠামো আর মহানগরী কলকাতা। পূর্বংগের তিনদিকে ঘিরে রইল ভারতের সীমানা, খোলা রইল জলপথ, পূর্বঙ্গকে বাঁচাতে হলে গড়ে তুলতে হবে সব কিছু, পশ্চিমবংগকে অনেক কিছু।

বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর অবিভক্ত বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে এক বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পূর্বঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। এই দৃষ্টিকটু সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের কারণ যাই হোক এর ফলে হয়েছে শ্রেণী বিরোধ। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা আনবার একটা তীব্র প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পূর্বংগবাসী পাকিস্তানী মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা শ্রেণী বিরোধকে মর্মান্তিক করে তুলেছে। ভারতীয় নেতাদের ও সাংবাদিকদের অসংযত মন্তব্যও এর মূলে রয়েছে। বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হবার পর থেকেই হিন্দুরা চলে আসছে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি, খাদ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করা ক্ষীণশক্তি ও ক্ষুদ্র পশ্চিমবংগের পক্ষে বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবংগের মুসলমান সংখ্যায় অল্প এবং হিন্দুর চেয়ে সব বিষয়েই অবনত। ফলে, হিন্দুর ঈর্ষা ও মুসলমানদের সামর্থ্য—এ দুয়েরই অভাব। সাম্প্রদায়িকতা তাই পশ্চিমে কম ও পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমান কমই গেছে পূর্ব দিকে—গেছে ভয়ে নয়, জীবিকা লাভের

সুবিধার জন্য এবং অনেকে ফিরেও এসেছে নব গঠিত রাষ্ট্রের অসুবিধা ও অব্যবস্থার তাড়নায়। তাহলে দেখা গেল যে পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রায় আগের মতই রয়েছে, সমস্যা হয়েছে পুর্ববঙ্গবাসী বিপুল আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে। আসল সমস্যা কিন্তু পুর্ববঙ্গেই কারণ শ্রেণী সংঘর্ষ উত্থান পতন ও দেশত্যাগ ঘটেছে সেখানেই।

পুর্ব ও পশ্চিমের পারস্পরিক সমস্যাই প্রমাণ করে বাংলা বিভাগের কৃত্রিমতা। তাই পুনর্বসতির সাময়িক ব্যবস্থা করলেও আসল সমাধান আসবে সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনে—যার ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা। স্থানান্তরের ফলে পুর্ব ও পশ্চিম দুই-ই বিপন্ন হবে একাধিক কারণে। দ্রুত বর্ধমান লোক সংখ্যার বসতি ও জীবিকার জন্যও স্থান ও সম্পদের অভাব হবে। অ-বিভক্ত বাংলা ছিল ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে পঞ্চম কিন্তু লোক সংখ্যায় প্রথম। এখন থেকে ঘন বসতির বিবিধ সমস্যার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা না করলে শুধু বাংলা নয় সারা ভারতই অনতিবিলম্বে বিপন্ন হবে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের ওপরে দাবী তাই এ দিক দিয়েও যুক্তি সংগত······

কিন্তু ১৯৩৯-এর পর থেকে নানা কারণে বিশেষত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এখানকার নিম্ন মধ্যবিত্ত এমন বিপন্ন হয়েছে যে নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তার পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে। তা ছাড়া মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বামপন্থী অসন্তোষ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের আকার নিচ্ছে।

এই সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে পুর্ব ও পশ্চিমে যে ঐতিহাসিক শক্তি পুঞ্জীভূত হবে তার আঘাতে আগামী যুগে বিপ্লবী পরিবর্তন হতে বাধ্য। র‍্যাডক্লিফের কৃত্রিম বিভাগের বিরাট ভুল হয়তো এইখানেই ধরা পড়বে এবং দু'পক্ষের নিদারুণ অসুবিধার ভেতর দিয়েই হয়তো জাগ্রত হবে একদিন শুভ সমাজ-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক কল্যাণ।

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 'বাঙালী' বইটিতে বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বৃটিশ যুগ হতে অত্যাচার ও অবহেলার যে নিদর্শনগুলি পরিসংখ্যান সহ তুলে ধরেছেন তা যে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর এক নিরপেক্ষ দর্পণ সে বিষয়ে ডক্টর সত্যপ্রকাশের মনে কোন সন্দেহ থাকে না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যে সর্ব ভারতীয় নেতৃত্ব থেকে প্রথমে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে প্রগতিহীনতার দোহাই দিয়ে এবং সুভাষচন্দ্রকে অতি বিপ্লবীয়ানার দোহাই দিয়ে সুকৌশলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে পারেন ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশ। সুভাষচন্দ্রের সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করেও কংগ্রেস থেকে প্রস্থানের সুযোগে যে দু'জন বঙ্গ সন্তান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢুকলেন তাঁরা দু'জন হলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

ডক্টর সত্যপ্রকাশ ভাবতে থাকেন গান্ধীজীর উপদেষ্টাদের অন্যতম ডঃ ঘোষ স্বাধীনতা উত্তরকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রাইজ পোস্ট পেলেন বটে কিন্তু ভেজালদার ব্যবসায়ীদের ধরায় এবং গান্ধীজীর অনুরোধ-পত্রানুসারে এ বাংলার ক্যাবিনেটে অন্ততঃ একজন মাড়োয়ারি মন্ত্রী না নেবার অপরাধে অপসারিত হলেন। আর ডাঃ বিধান রায় মাড়োয়ারী গ্রহণের সর্তে রাজী হয়ে রাইটার্সে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্বের গদিতে আসীন হলেন। ডাঃ বিধান রায়ের প্রবেশ ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের প্রস্থানের ঘটনায় গান্ধী নেতৃত্বের প্রকৃত চরিত্র প্রতিভাত হয়েছে বুদ্ধিমান বাঙালী মহলে। আর শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর একদার উপদেষ্টা ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে কংগ্রেস পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-ধন্য দেশনায়কের কংগ্রেস ত্যাগ এবং পরবর্তীকালে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল বৈকি।

গান্ধী কংগ্রেস ও নেহেরু নেতৃত্ব প্রকৃতই ইংরেজের কাছ থেকে 'স্বাধীনতা' চেয়েছিল কিনা—এই প্রসঙ্গে ভাবতে ভাবতে ১৫ই

আগষ্ট '৬২-র আনন্দবাজারের কাটিংয়ে সত্যকপ্রকাশ দৃষ্টি বুলাতে থাকেন—

নেহেরু-মাউণ্টব্যাটেন এক হো!

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭; ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান, দেশ স্বাধীন হল, দেশ বিভক্ত হল। দিল্লির রাজপথে জনতার জয়ধ্বনি "মাউণ্টব্যাটেনকা জয়! নেহেরু মাউণ্টব্যাটেন এক হো"। ইতিহাস অরসিক, দেশ স্বাধীনতা পেল, দেশ দ্বিখণ্ডিত হল; ইতিহাস সুরসিক, ১৮২ বৎসরের বৃটিশ শাসনের অন্তিমলগ্নে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি ও রাজপ্রতিনিধি-পত্নীর স্তবগানে রাজধানী দিল্লির রাজপথ মুখরিত। ইতিহাস ক্রূর কুটিল, একই দিনে দিল্লি যখন স্বাধীনতা-উৎসব সমারোহে ঝলমল, অমৃতসরে লাহোরে তখন আগুন জ্বলছে, সে আগুনে পুড়েছে, মরেছে হাজার হাজার নিরীহ নরনারী। প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেক আশঙ্কা করেছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে এ দেশে বৃটিশ-সন্তান যারা আছে তাদের উপর আক্রমণ। মাউণ্টব্যাটেন কিংবা তাঁর প্রধান সেনানায়ক কেউই বেচারা ভারতবাসীর ধনপ্রাণহানির সম্ভাবনাকে আমল দেননি। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর রাজবংশীয় কায়দায় অভয় দিয়েছেন, "কুছপরোয়া নেই, দেশ-বিভাগের ফলে কোথাও এক ফোঁটা রক্তপাত ঘটতে দিচ্ছি না; বাউণ্ডারী ফোর্স অর্থাৎ সীমান্ত বাহিনীর জোয়ানরা সব গণ্ডগোল তুরন্ত ঠাণ্ডা করে দেবে।" দিল্লি ও করাচির মসনদে আরোহমান রাষ্ট্রনেতাদেরও সেই কথা। পেণ্ডরেল মুন সখেদে মন্তব্য করেছেন, এ-দেশের নেতারা শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্যে পরমবিশ্বাসী। সে-দিক থেকে নেহেরু জিন্না দুজনেই 'একদিল' তাঁরা ফতোয়া দিলেন; গোলমাল, রক্তারক্তি আর কেন? দেশ-বিভাগেই তো সব গোলমালের নিষ্পত্তি; আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আশ্বাস দিচ্ছি, মাভৈঃ, যে

যার মত যেখানে আছ ঠিক থাকো। গোলমাল, রক্তারক্তি কোথাও কিছুতেই ঘটতে দেব না!

তারপর?

তারপরের ইতিহাস আমরা জানি আজও লেখা শেষ হয়নি। বৃটিশরাজের অস্তিমকাল আর বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী কালের জটিল, যন্ত্রণাময়, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারীর ছিন্নভিন্ন জীবনমরণ লীলার মর্মন্তুদ ইতিহাস কোনোকালেই লেখা হবে কি না সন্দেহ। দেশ-বিভাগের বলি হয়েছে কত লোক তার সঠিক হিসাব কারোরই এখন পর্যন্ত জানা নেই। আন্দাজী হিসাবে সাধারণত ধরা হয় নিহতের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। বৃটিশ আমলা এবং পরিদর্শকরা কেউ কেউ হিসাব করেছেন নিহতের সংখ্যা ছয় লক্ষের কম নয়। এছাড়া অপহৃতা তরুণীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। আর ভিটামাটি-ছাড়া হয়েছে যারা তাদের সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ এবং সেখানেই ইতি নয়। কারণ পেণ্ডরেল মুনের ভাষায় নেতারা শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী পরস্পর সদ্ভাব এবং সদাচরণের চুক্তিতে সই দিয়েই বিবেক-পীড়ার দায়মুক্ত। সর্বোপরি ছিলেন সর্ব-সিদ্ধিদাতা লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। অতএব মাউণ্টব্যাটেনের ম্যাজিকের গুণে "বিনা রক্তপাতে" দেশ স্বাধীন হল, প্রায় বিনা প্রতিবাদেই দেশ বিভক্ত হল, আর বিভক্ত ভারতে যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হল তার তরঙ্গভঙ্গে এই বিচিত্র মহাদেশ ও মহাদেশের কোটি কোটি নরনারী আজ পনের বৎসর পরেও উত্তরোল।

মাউণ্টব্যাটেন কি জয়

"ম্যাউণ্টব্যাটেন কি জয়"—ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা রচনায় ও প্রযোজনায় এর চেয়ে অর্থগূঢ় ধ্বনি ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের ইতিহাসে আর কিছুই

হতে পারে না। মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীকে সুকৌশলে নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিলেন কারণ গান্ধীজী ছিলেন পাকিস্তানের, দেশবিভাগের প্রবলতম বিরোধী। মাউণ্টব্যাটেন নেহেরুকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পেরেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্দার প্যাটেলকেও। মৌলানা আজাদ তাঁর আত্মকাহিনীতে এ নিয়ে যে ক্ষুব্ধ অভিযোগ করেছেন তার যথার্থতা অন্যান্য সূত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশবিভাগ সম্পর্কিত সরকারী দলিলপত্র ইত্যাদি অবশ্য ১৯৯৯ সনের আগে প্রকাশিত হবে না। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশরাজের অন্তিম লগ্নের অভিনয় যাঁরা সাজঘর থেকে, রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশে আড়াল থেকে মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করেছেন কিংবা ভি. পি মেননের মত যাঁরা দেশ-বিভাগের পরিকল্পনারচনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত বিবরণী থেকে দেশ-বিভাগের অপ্রকাশিত ইতিহাসের কিছু কিছু সূত্র এখনই পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য লিওনার্ড মোজলী নামে একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক যিনি তিন বৎসর ধরে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও ব্রিটেনে নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেশ-বিভাগের রহস্য সম্পর্কে বহু তথ্য এবং তাঁর মূল্যবান মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত 'দি লাস্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ' গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থের মূল বক্তব্য দেশ-বিভাগের কৃতিত্ব এবং বিপর্যয়-কর পরিণাম, দুয়ের জন্যই দায়ী মাউণ্টব্যাটেন-ম্যাজিক; লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনের ইন্দ্রজালে ধরা পড়েছেন নেহেরু, ধরা পড়েছেন সর্দার প্যাটেলও এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী হাল ছেড়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন-ম্যাজিকের দ্রুতগতি প্রকৃতি, প্রভাব ও পরিণাম সম্পর্কে লিওনার্ড মোজলীর ঘটনাবিন্যাস ও মন্তব্যসমূহ যেমন চমকপ্রদ তেমনি আশ্চর্য রকমের যুক্তিনিষ্ঠ।

লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন রাজধানী দিল্লীতে পদার্পণ করেন ১৯৪৭ সনের ২২শে মার্চ। পাকিস্তানের পরিকল্পনা তখনও মাউণ্ট-ব্যাটেনের কাছে পর্যন্ত মরীচিকাসদৃশ। কংগ্রেস নেতারাও সে-সময়ে

কল্পনা করতে পারেন নি যে, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করে "মথইট্‌ন্" অর্থাৎ পোকায়-খাওয়া পাকিস্তান নিতে জিন্না কখনও রাজী হবেন। ওদিকে লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ঘোষণা করেছেন যেভাবেই হোক ১৯৪৮ সনের ১লা জুন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। মাউণ্টব্যাটেন অতদিন সবুর করতে নারাজ ব্যক্তিগত কারণে। তিনি আরও তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চান— বৃটিশ নৌবাহিনীর বড়কর্তার পদ অধিকার করার জন্য। ১৯৪৭ সনের মে মাসের প্রথমেই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পরামর্শদাতাদের সাহায্যে গোপনে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেললেন। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের তিনি জানালেন, আর বিলম্ব নয়। স্থির হল যে মাসের শেষেই বৃটিশ সরকার লণ্ডন থেকে এই পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশ করবেন। মোজলী এই পরিকল্পনার নাম দিয়েছেন "ডিকী বার্ড" প্ল্যান অর্থাৎ মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের ঘরোয়া পরিকল্পনা। শেষ মুহূর্তে মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে "ডিকী বার্ড" প্ল্যানের খসড়া দেখে নেহেরু মহারুষ্ট এবং ফলে ম্যাজিসিয়ান লর্ড ও লেডী মাউণ্ট-ব্যাটেন বিভ্রান্ত। তখন নতুন খসড়া রচনার জন্য ডাকা হল রিফর্মস দপ্তরের ভি.পি. মেননকে। তখনি চার ঘণ্টায় দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রস্তুত ; নেহেরু রাজী। দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা পকেটস্থ করে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন পাড়ি দিলেন। ১৪ই মে (১৯৪৭) অ্যাটলী মন্ত্রীসভার বৈঠকে ভারতব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা অনুমোদিত হল ঠিক মাত্র পাঁচ মিনিটে। অতএব "মাউণ্টব্যাটেন কি জয়! মাউণ্টব্যাটেন-নেহেরু এক হো।"

দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা সরকারীভাবে গৃহীত হয় ১৯৪৭ সনের মে মাসের শেষ দিকে। মাউণ্টব্যাটেন মহা খুশী, আর বিলম্ব নয়, ১৫ই আগস্টের মধ্যেই দেশ-বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব সমাপ্ত করা চাই। মাউণ্টব্যাটেনের মেজাজ যখন শরীফ থাকে তখন তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের বংশ তালিকা রচনায় সময় কাটান। নেহেরুর মেজাজ খারাপ থাকলে তিনি ঘুমের ঘোরে অনর্গল কথা বলেন।

মোজলী লিখেছেন 'মাউণ্টব্যাটেন কি জয়'এর শুভলগ্নারম্ভে ঠিক তাই ঘটছিল।

র‍্যাডক্লিফের রগড়

দেশ তো ভাগ হবে, কিন্তু কোথায় কী ভাবে? মাউণ্টব্যাটেনের আর যেন সবুর সয় না, কংগ্রেস ও লীগনেতারাও তখন যাহোক একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য উদ্‌গ্রীব। লণ্ডন থেকে ডেকে আনা হল সার্ (এখন লর্ড) র‍্যাডক্লিফকে। ঝানু আইনজীবী আপসনিষ্পত্তিতে, বাটোয়ারাব্যবস্থায় পাকা হাত। তবে কথা কী, ভারতবর্ষ নিয়ে কিংবা রাজনীতি নিয়ে কস্মিনকালেও ভদ্রলোক মাথা ঘামানোর সময় পাননি। কংগ্রেস ও লীগ দুই পক্ষই মেনে নিল সেই তো আচ্ছা হ্যায়! যে সাহেব-উকিল ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র পর্যন্ত কখনও খুঁটিয়ে দেখেননি তাঁর চেয়ে পক্ষপাতশূন্য বাটোয়ারা-ব্যবস্থাপক আর কেই বা হতে পারে? যে যত অজ্ঞ সেই তত নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ।

অতএব র‍্যাডক্লিফ এলেন এই বিরাট দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বিভক্ত ভাগ্য-নির্ধারণে। আসবার আগে ইণ্ডিয়া অফিসে আধ ঘণ্টার জন্য ভারতবর্ষের মানচিত্রখানার উপর তিনি চোখ বুলিয়েছিলেন। র‍্যাডক্লিফ দিল্লিতে পৌঁছলেন ৮ই জুলাই (১৯৪৭); মাউণ্টব্যাটেনের হুকুম পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে র‍্যাডক্লিফকে দেশ-ভাগ-বাটোয়ারার কাজ শেষ করতে হবে। নেহেরু এবং জিন্না জানালেন পাঁচ সপ্তাহই বা কেন, আরও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হলেই ভাল। কাজ শেষ অবশ্য হল; ৯ই আগস্ট বাংলার, ১১ই আগস্ট পাঞ্জাব ভাগ-বাটোয়ারার দলিলপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি র‍্যাডক্লিফ লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের হাতে তুলে দিলেন। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিবরণ কিন্তু তখনও মাউণ্টব্যাটেনের গোপন সিন্দুকে জমা রইল। পাঞ্জাবের হিন্দু শিখ মুসলমান কেউই জানল না ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ মুহূর্তেই

কোথায় কোন্ জেলা কোন্ তালুক কোন্ থানা কার ভাগে পড়বে? একই প্রহেলিকা বিভক্ত বাংলা সম্পর্কে। মাউণ্টব্যাটেন-ম্যাজিকের দৌড় এখানেই শেষ। এর পর যা ঘটল, দর্পিত, অসহিষ্ণুচরিত্র মাউণ্টব্যাটেনের শান্তিরক্ষার আলগা প্রতিশ্রুতি যে ভাবে মর্মান্তিক প্রহসনে পরিণত হল তার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন জানতেন তাঁর পকেট থেকে দেশ বিভাগের মৃত্যুবাণ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদখানা বের করা মাত্র প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঘটবে। ১৫ই আগষ্ট উৎসবদিবস পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিবরণ গোপন রেখেছিলেন ; রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বিভক্ত এলাকাগুলিতে যে বিক্ষোভ ঘটবে তার প্রতিরোধের জন্য মাউণ্ট-ব্যাটেন কিংবা সেনাবাহিনীর বড়কর্তারা সুদৃঢ় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেও উদ্যোগী হননি।

মাউণ্টব্যাটেন-ম্যাজিক, নেহেরুর আত্মসমর্পণ, গান্ধীজীর পরাভব জিন্নার চিত্তবিকার, সব মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তিমলগ্নে ভারতবর্ষে যে ট্রাজি-কমেডির অভিনয় হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাজ এখনও অসমাপ্ত। লিওনার্ড মোজলীর মতে এই পর্বে মারাত্মক ভুল ঘটেছে একটার পর একটা। যেমন অখণ্ড ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করা উচিত হয়নি। ব্রিটেনের লেবার গভর্ণমেণ্ট যখন ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তখন ম্যাউণ্ট-ব্যাটেনের ব্যক্তিগত গরজে তাড়াহুড়ো করে দশ মাস আগেই দেশ ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্যোগী হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর হয়েছে। তারপর দেশভাগের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হলেও কোথায় কীভাবে দেশ বিভক্ত হবে সে-বিষয়ে কিছুমাত্র ধীরভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়নি। যে মাসে দেশভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলেও, যে মাস থেকে পনেরই আগষ্ট ক্ষমতাহস্তান্তর পর্যন্ত দেশ-বিভাগের প্রকৃত চিত্র জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে এমন কী বিভক্ত রাজ্যগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তা

রক্ষার কোন পরিকল্পনাও যথাসময়ে প্রস্তুত করা হয়নি।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ অবশ্য অপূর্ণ থাকেনি। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল আর্ল মাউন্ট-ব্যাটেন অব বার্মা অ্যাটলীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন। মাউন্টব্যাটেন ম্যাজিকের অসামান্য প্রভাব সম্পর্কে মোজলী বিশেষভাবে নেহেরুর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

"By the end of their three-hour talk, Nehru was completely won over and Mountbatten had the measure of the man···He was Mountbatten's man from that moment on, and his attachment to the Mountbatten menage was much increased by his subsequent contact with Lady Mountbatten."

১৯৪৭ সনের পনেরই আগস্টের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের ঘটনাধারার অলিখিত ইতিহাসের কিংবা যাকে বলা হয় 'কী হোল ভিউ অব হিষ্ট্রি'র (Key-hole view of history) সূত্র আবিষ্কারে মোজলীর এই উক্তির তাৎপর্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

(লেখক—সরোজ আচার্য্য)

একদার কংগ্রেস কর্মী শ্রীসুনীল কুমার গুহ লিখিত 'স্বাধীনতার আবোল-তাবোল বইটির আর একস্থানে ডক্টর সত্যপ্রকাশ দৃষ্টি ফেললেন—

কংগ্রেসকে দিয়ে পাকিস্তান দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য মুসলিম লীগ নেতা জিন্না সাহেব যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যবস্থা করে-ছিলেন সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসেই (Direct Action Day) কলকাতায় বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল, যার নাম হয়েছে Great Calcutta Killing। এই দাঙ্গায় কম পক্ষে দশ হাজার লোক হিন্দু এবং

মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য মুসলিম লীগ অনেক আগে থেকেই ফতোয়া জারী করেছিল, আর তার জন্য প্রস্তুতিও চলছিলো। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যাপারটা যে কি হতে পারে তা ঐ তারিখের আগে কেউই আঁচ করতে পারেনি।...... বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর তক্তে বসে যে সুরাবর্দী সাহেব এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্ল্যান এঁটেছিলেন, তিনি বেশ একটু বেকায়দায় পড়লেন।......হিন্দুপ্রধান কলকাতায় যা সুবিধা হল না, সেটা তিনি মুসলমানপ্রধান নোয়াখালিতে অনায়াসেই পুষিয়ে নিলেন।......

ইতিমধ্যে অবশ্য ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের লোকেদের নিয়ে কেন্দ্রে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন। সেই অস্থায়ী সরকারের কংগ্রেসী জহরলাল, প্যাটেল বা লীগ দলীয় লিয়াকৎ আলী, গজনফর আলী এই সব হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্য কিছুই করতে পারেননি। শুধু ইংরেজ কবে তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় হয়ে যাবে সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখেছেন। ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকার ক্যাবিনেট মিশন নাম দিয়ে এক মিশন এ দেশে পাঠিয়েছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করা। তাঁরা এদেশে আলাপ আলোচনা করে দুটো প্রস্তাব রেখে গিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে মুসলিম লীগের দাবী অনুযায়ী ভারতকে দু'ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর, আর অন্যটি ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হিন্দুপ্রধান দেশ, মুসলমানপ্রধান দেশ, আর দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে আধা-স্বাধীন প্রদেশ গঠন করা।

কংগ্রেস প্রথম প্রস্তাবটি তার কল্পনার বাইরে বলেই মনে করেছিল, আর দ্বিতীয়টিও মানতে পারছিল না এই জন্যই যে আসাম প্রদেশটিকে মুসলমান প্রধান প্রদেশ বাংলার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস বা দেশের কাছে এ'দুটি প্রস্তাবের কোনটিই

গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা, তা অতি সত্য কথা, দুটোই ছিল অতি সর্বনাশকর। কিন্তু প্রস্তাব দুটিকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে ঠিক জিনিস আদায় করবার জন্য চাপ দেওয়ার ইচ্ছা বা ক্ষমতাও কংগ্রেসের ছিলনা। ভয়, পাছে বেশী চাইতে গেলে ইংরেজ কিছু না দেয়। আরও ভয় ছিল, বেশী চাপ দিতে গেলে ভারতীয় সৈন্যদলে যদি গণ্ডগোল শুরু হয়, যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়, তাহলে কি হবে। তাহলে ক্ষমতা তো কংগ্রেসের হাতে আসবেই না, যারা জোর করে দখল করতে পারবে তাদের হাতেই যাবে। ক্ষমতা যদি আমাদের হাতেই না পড়ল তাহলে দেশ স্বাধীন হল কি না হল তাতে কি আসে যায়—ভাবটা অনেকটা এই ধরণের আর কি।

এই জন্যই কংগ্রেস হাঁ, না—কিছুই না বলে বা কোন কর্মপন্থা না নিয়ে শুধুমাত্র যেন তেন প্রকারেণ অস্থায়ী সরকারের গদি আঁকড়ে বসেছিল আর ঘুসঘুস করে কেবল সময় কাটাবার আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। পরপর তিনটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার ফলে গভর্ণমেণ্ট যে আসলে ভেঙ্গে পড়েছিল, অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল, সেটুকু বুঝবার বা কাজে লাগাবার সময় সুযোগ তাদের কখনোই হয়নি। দেশের স্বাধীনতা তো নয়, এ যেন চোরাই পথে চুপেচাপে ভিক্ষে করে বা মূল্যের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাই-ই তাদের নীট লাভ।

অভূতপূর্ব এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো যে ভারতে বৃটিশ শাসন ভেঙ্গে দিয়েছিলো, তা কিন্তু সাধারণ অনেকেরই বুঝতে দেরী হয়নি। তাই সুযোগটাকে যারা কাজে লাগাতে চায়, হাজারে হাজারে তারা কাজে লেগেও গিয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং নানারকমের বোমা তৈরীর কাজটা এই সময়ে বেশ বৃহৎ আকারেই আরম্ভ হয়েছিল। বিগত যুদ্ধ আর আমেরিকান সৈন্যদের কল্যাণে দেশে তখন বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না। কাজটা অবশ্যই ছাড়াছাড়ি ভাবেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টাও হচ্ছিল বিশেষ ভাবেই। ঐ সময়ের খবরের কাগজ খুললে এমন একদিনও প্রায় বাদ যেত

না, যে দিন এখানে ওখানে কলকাতার আশে পাশে দু'চারটে বোমা ফাটবার সংবাদ থাকতো না। অশিক্ষিত হাতে বোমা তৈরী করতে গিয়ে অনেক ছেলে হতাহত হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ছিল প্রায় নগণ্য, দু'একজন মাত্র। সরকারী শাসনে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে এমন ভাগ হয়ে গিয়েছিল যে আগের মত একটা বোমার খবর পেলে তাড়াহুড়ো করে দেশ সুদ্ধ লোককে গ্রেপ্তার করা আর মোটেই সম্ভবপর ছিল না। ভারত সরকারের পুলিশের বুদ্ধিমান বিভাগ, মানে I. B. Department-কে প্রধানত হিন্দু বিপ্লবীদের নিয়েই কারবার করতে হয়। তাই ঐ বিভাগটিও প্রায় আগাগোড়াই হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হত। দাঙ্গার ফলে যখন বুদ্ধিমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ল তখন শাসন ক্ষমতা যে কত অকর্মন্য হয়ে পড়েছিল তা বেশী না বললেও বুঝা যায়। একটা ঘটনার কথা আমার জানা আছে যেটি বললে অনেকেই বুঝতে পারবেন যে সত্যিকারের স্বাধীনতার কাজ করবার কি বিরাট সুযোগ তখন এসেছিল, আর আমরা কি সুযোগ হারিয়েছি। ঐ সিজার্স সিগারেটের প্রচার ছবির মতই বলতে ইচ্ছা যায়: "আপনি জানেন না, আপনি কি হারিয়েছেন।" লড়াই করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা যে ভারতের অহিংস নেতাদের ছিল, এ অপবাদ তাঁদের পরম শত্রুও যেন না দেয়। খনিতে পাথর ফাটাবার কাজে যে অতি বিস্ফোরক 'জেলিগনাইট' নামক পদার্থটি ব্যবহার করা হয়, তারই একটা খণ্ড ঢালাই লোহার খোলের মধ্যে ডিটোনেটার সহ পুরে দিয়ে ফিউজ সাহায্যে আগুন দিতে পারলে যে একটি অতি বিস্ফোরক হাত বোমা তৈরী করা যায়, এ সত্যটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪২ সালের হৈ-হল্লার সময়। কিন্তু তখন ঐ জিনিসটাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ হয় নি। এবার কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে অসংখ্য বোমা তৈরী হয়ে জমা হতে থাকল। প্রচুর পরিমাণে ঐ 'জিলেগনাইট ষ্টিক' পদার্থটি সংগ্রহ করবার জন্য বহু ছেলে, অনেক অনেক হাঙ্গামা

করে বাংলা আর বিহারের খনি এলাকাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বস্তুত ক্রমেক্রমে জিনিসটি সংগ্রহ করাও হল অতি প্রচুর পরিমাণেই।

একদিন দুটি ছেলে বিহারের কোন খনি এলাকা থেকে ঐ ভাবে সংগ্রহ করা প্রভূত পরিমাণ (৮০ পাউণ্ডেরও বেশী) 'জিলেগনাইট ষ্টিক' এবং প্রয়োজনীয় ডিটোনেটর ও ফিউজ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসছিল। তখন পথে আসানসোলে তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গাঁজা আফিম চোরাই চালান বন্ধ করবার জন্য আসানসোলে Excise Department-এর যে সব লোক তল্লাসী চালায়, প্রথমে তারা তাদের হাতেই ধরা পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের মালসুদ্ধ পুলিশ অফিসে হাজির করা হয়। এবং শুনে নিশ্চয়ই আজ অনেকে আঁৎকে উঠবেন যে, সেই ছেলেদুটোকে পুলিশ সেদিন গ্রেপ্তার না করেই ছেড়ে দিয়েছিল, সসম্মানেই ছেড়ে দিয়েছিল এবং মালসুদ্ধই। কোন ঘুষও সেদিন পুলিশকে দিতে হয়নি, বরং পুলিশ এবং Excise লোকেরা এ সব জিনিস আসানসোল দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে অনেক পরামর্শও সেই ছেলে দুটোকে দিয়েছিল।

বাহাদুরী দেখাতে পারলে প্রমোশন, আর ব্যাপারটা জানাজানি হলে যে নিজেদেরই জেলে যেতে হবে এ কথা ভারতীয় পুলিশ সেদিন বিশেষ ভাবেনি। ব্যাপারটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল এই জন্যই যে, ঐ সময়ে পুলিশ অফিসে বা Excise অফিসে একজনও মুসলমান কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তাই বলছিলাম যে ইংরেজের শাসন ভেঙ্গে পড়ছিল ; ইংরেজের পুলিশও আর সেদিন তার হাতে ছিল না। এ রকম ঘটনা একটি মাত্রই নয়, অনেক হয়েছে। পুলিশের মধ্যস্থতায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারও হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়রা সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেনি, আর কংগ্রেসী নেতারা ত ঐ অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতাটুকু পেয়ে, রক্তের স্বাদ পাওয়া ব্যাঘ্রের মতই হিংস্র এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, বাকীটুকু পাবার জন্য। এই ত হচ্ছে

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস। কাজের কোন প্রয়োজন নেই, বোলচাল মেরে, টালিবালি করে ক্ষমতাটুকু আমাদের হাতে এসে গেলেই হল। তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আজও ভারতে যা হচ্ছে তা ঐ ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অহিংস উপায়ে, শান্তিপুর্ণ-উপায়ে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আনা হবে—এই ভণ্ডামির ঢং দেখাতে গিয়ে ভারতের মাটিতে আজ পর্যন্ত যত রক্তপাত হল, যত লোককে ভিটেমাটি ছেড়ে রাস্তায় আসতে হল, যত মেয়েকে পতিতাবৃত্তি করে উদরপূর্তি করতে হল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কতগুলো আছে জানিনা, মনে হয় দুটো মহাযুদ্ধ বাদে এত বড় ধ্বংস পৃথিবীতে আর আসেনি। মহাযুদ্ধ দুটোও একদিন শেষ হয়েছে, আবার নতুন করে পুনর্গঠিত হয়েছে দেশগুলো। কিন্তু ভণ্ডামি আর ক্লৈব্যতার ফলে ভারতে যে ধ্বংসের আবির্ভাব হয়েছে, তার শেষ ত আজও দেখা যাচ্ছে না। তবুও বলতে হবে গান্ধী মহাত্মা অহিংস এবং শান্তিপুর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা এনে কি এক অপুর্ব চিজ পয়দা করেছেন! ক্ষমতা হাতে থাকলে কি না প্রচার করা চলে।

১৯৪৭ সাল আরম্ভ হতে না হতেই শোনা যেতে লাগল দেশ ভাগ করে ক্ষমতা আহরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রকাশ্য-ভাবে মতস্থির করতেও খুব বেশী দেরী হল না। মাস দুয়ের মধ্যেই অতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হল বাংলা আর পাঞ্জাব সমেত ভারত ভাগ করে নেওয়া হবে। এ ভিন্ন নাকি অন্য উপায় আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। উপায় ত নেইই, উপায় থাকতে হলে যে সততা, সাহস এবং কর্মক্ষমতা থাকা দরকার, তাই যখন নেই তখন উপায় থাকবে কোথা থেকে! কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার লোভে কংগ্রেস নেতারা দেশভাগ করতে রাজী হলেই যে দেশের লোক সেটা মেনে নেবে এ রকম স্থিরতা কিছুই ছিল না, বরং বহু জায়গায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন স্বতস্ফুর্ত ভাবেই

প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। তবে ডবল 'ঘ'—মানে ঘুঘু এবং ঘোড়েল অহিংস নেতাদের মিথ্যা বোলচাল আর ভাঁওতাবাজীর সম্মুখে সে আন্দোলন ব্যাপক হতে পারেনি কোনক্রমেই, স্তব্ধ হয়ে গেছে আন্দোলন। এ সব ব্যাপারে যে অহিংস কোম্পানী খুবই সিদ্ধহস্ত তাতো আজ সবাই হাড়েহাড়েই টের পাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই মিথ্যাচারিতা এবং ভাঁওতাবাজী যে কতদূর নীচুস্তরের হতে পারে তা আর বলে শেষ করা যায় না। দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন যাতে দানা বাঁধতে না পারে এবং জনসাধারণ যাতে বিভ্রান্ত হয়, এই ডবল উদ্দেশ্য নিয়েই নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাবটিকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে মুখরোচক ভাবেই উত্থাপন করা হয়েছিল। প্রস্তাবটি ছিল, "Under no circumstances we will recognize any part of India as Pakistan,but to facilitate the withdrawal of British force from India, we will recognize it as a temporary phase." মোট কথা, যে কোন উপায়েই হোক ক্ষমতাটা একবার নিজেদের দলের হাতে পেতেই হবে, তাতে দেশ থাক আর নাই থাক।

গান্ধীজী কিন্তু ভাঙেন, তবু মচকান না। তিনি হুঙ্কার দিলেন দেশভাগ করতে হলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর এই কথাটা সত্যিই ফলেছিল, তবে দুঃখ এই যে দুষ্কর্ম তখন হয়ে গেছে। তবে তাঁর ঐ হুঙ্কার পর্যন্তই, বেশী কিছু করবার প্রয়োজন নেই। তিনি হুঙ্কার দিয়েই চুপ মেরে থাকলেন। আর তাঁর মানসপুত্র এবং অন্য সব সাগরেদরা দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ কার্যটি নির্বিঘ্নেই করে ফেল্লেন। সত্যিই যদি গান্ধীজী মনে করে থাকতেন যে দেশভাগ করাটা উচিত হবে না বা দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক হবে, তাহলে অবশ্যই তাঁর উচিত ছিল সাধারণকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা। তাঁর উচিত ছিল নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে আসা। তিনি উচিত কিছুই করলেন না শুধু এক হুঙ্কার ছেড়ে বসে থাকলেন।

(হয়ত তিনি ভেবেছিলেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে, ক্ষমতাও হাতে এসে যাবে, আর দেশভাগ করবার কলঙ্কও তাঁর মহাত্মা নামে স্পর্শ করবে না) তাঁকে অনেক ভাবে দেখেছি কিনা, তাই তাঁর মস্তিষ্ক যে এসব ব্যাপারে বেশ পরিপক্কই ছিল, তা বেশ বুঝতে পারি।

গান্ধীজীর যে দেশ বিভাগে পুরা সম্মতি ছিল, তিনিই যে সস্তায় ক্ষমতালাভের পন্থা উদ্ভাবনের প্রধান দার্শনিক, এটুকু বিশ্বাস করতে এখনও অনেকেরই বেশ কষ্ট হয় বলেই মনে হয়। তিনি প্রার্থনা সভায় যে সব কথাবার্ত্তা বলতেন, দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে যেসব জেহাদী শ্লোগান আওড়াতেন, সেগুলোই যে এই অবিশ্বাসের প্রধান কারণ তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু তাঁর ঐ কথাগুলোর ভেতর যে সততার লেশমাত্রও ছিল না সেটুকু কেউই তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন বলেও মনে হয় না। একটু চেষ্টা করলেই যে কেউ বুঝতে পারেন যে তাঁর ঐ কথাগুলোয় সাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চালবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। "Under no circumstances we will recognize any part of India as Pakistan......" কথাটিও কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঠিক যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, গান্ধীজীর দেশ বিভাগ বিরোধী কথাগুলোও বলা হত ঐ একই উদ্দেশ্যে, উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা। ঐ সময়ের রাজনীতির একমাত্র প্রামাণ্য দলিল Allen Campbell-Jhonson লিখিত "Mission With Mountbatten" বইখানি একটু তলিয়ে পড়লে যে কেউই গান্ধী-মহাত্মার দেশবিভাগ বিরোধীতার স্বরূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

২রা জানুয়ারী ১৯৪৭-এ মাউণ্টব্যাটেনের সাথে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের যে বৈঠক হয় তাতেই কংগ্রেস ও লীগ-নেতারা দেশবিভাগে তাদের সম্মতি জানায়। ঐ সম্মতি লাভের পর, অতি শঙ্কিত হৃদয়ে মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ঐ বিষয়ে তাঁর মত জানবার জন্য। শঙ্কিত হৃদয়ে, কারণ, সাধারণের মতই মাউণ্ট

ব্যাটেনেরও ধারণা হয়েছিল যে গান্ধী সত্যিসত্যিই দেশবিভাগের বিপক্ষে। তাঁর সন্দেহ ছিল যে শেষ মুহূর্তে গান্ধীই হয়ত দেশ-বিভাগের প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেবেন। কিন্তু গান্ধী কিছুই ভণ্ডুল করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে গান্ধীর সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা বইখানিতে আছে, নীচে হুবহু সেইটুকুই তুলে দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি এটুকু থেকেই সমঝদারেরা বুঝে নিতে পারবেন যে ভারত বিভাগের মূলে কে?

"গান্ধীজী কতকগুলি পুরোনো ও ব্যবহৃত খামের টুকরো সম্মুখে রেখে বসেছিলেন। প্রথমেই একটি টুকরোর উপর লিখে গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন আজ তাঁর মৌনতার দিবস। একথা জানামাত্র মাউণ্টব্যাটেনের শঙ্কাকুন্ঠিত মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যাক গান্ধীজীর বক্তব্যের সম্মুখীন আজ আর হতে হবে না। নীরব সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হল। কাগজের টুকরোগুলি মাউণ্টব্যাটেন কুড়িয়ে জমা করলেন। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন, তিনি আজ পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক নিদর্শন বস্তু সংগ্রহ করেছেন, তাঁর মধ্যে ঐ কাগজের টুকরোগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান। কাগজের টুকরোগুলিতে গান্ধীজী লিখে দিয়ে গেছেন: "আমি আজ কথা বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমি সোমবারের মৌনব্রত গ্রহণের আগে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলাম, কি ধরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এই ব্রত ভঙ্গ করতে আমি দ্বিধা করব না। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চস্থানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হয়, এবং যদি কোন রোগীর সেবা কার্যের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে আমি ব্রত ভঙ্গ করে কথা বলব, এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম। কিন্তু, আমি বুঝেছি, আজ আমি মৌনব্রত ভঙ্গ করি, এটা আপনি চান না। জিজ্ঞাসা করছি আমি আমার বক্তৃতাগুলিতে আপনার বিরুদ্ধে কি একটি কথাও বলেছি? যদি আপনি বুঝে থাকেন যে আপনার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিনি তবে আপনার আশঙ্কা নিরর্থক। দু'একটি বিষয় আছে যে সম্বন্ধে আমাকে অবশ্যই আপনার কাছে কিছু বলতে

হবে, তবে আজ নয়। যদি আবার আমাদের দু'জনের দেখা হয় তবে এবং সেই সময়ই বলবো।”

ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার যে কোন টিকা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। গান্ধী সেদিন তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করেন নি, কারণ মাউন্টব্যাটেন সেটা চাননি; আর সম্ভবতঃ ঐদিনের আলোচনাটিকে গান্ধী তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করবার মত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। এবং এই ভাবেই মৌনব্রত ভঙ্গ না করেই দেশ ভঙ্গ করে তিনি অতিমানব মহাত্মা থেকে গেছেন!

মৌলানা আজাদের “India Wins Freedom” বইখানিতেও আজাদ সাহেব গান্ধী-জহরলালকেই দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন যে জিন্না সাহেব শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের দাবী ত্যাগ করতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু জহরলালের হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তাই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। জহরলালের হঠকারিতাপূর্ণ কথা যে বেশ প্ল্যান করেই বলা হয়েছিল, এবং গান্ধীসহ অনেক অহিংস নেতাই যে ঐ ব্যাপারে জহরলালের দস্তুরমত সমর্থক ছিলেন তাও তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন।

•

ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যপ্রকাশের মনে, বিবেকে পড়ে যাওয়া লেখাগুলি এমন এক অনুভূতি সঞ্চারিত করে যাতে তিনি যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। রাত তখন নিশুতির কোঠায়। হিমেল হাওয়ায় একটা মিষ্টি আস্বাদে ভরে যায় মন। একবার হাই ওঠে। মুখের কাছে তুরি মারেন। মনে হয়, তবে কি ঘুমের নিশানা এ? চেয়ারে বসেই টেবিলের উপর কনুইটা পেতে তাতে মাথা রাখেন। চোখ বুজে পরখ করতে চান সত্যই কি নিদ্রার নিঃশব্দ পদযুগল তাঁর অক্ষিযুগলে আসনপিড়ী হয়ে বসতে আসছে?·········বিস্ময়-উদ্বেল সত্যপ্রকাশের কানে যেন ভেসে আসে উড্ডীয়মান গর্জনশীল এক ঝাঁক সাদা পাখা-মেলা পায়রার মত এরোপ্লেনের কর্ণভেদি শব্দ।

স্ফূর্ত তিনি ছুটে যান সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাতের উপর। দেখেন মুহূর্তে ঝাঁকের পর ঝাঁক এরোপ্লেন এসে ছেয়ে ফেলে আকাশের সূর্যালোক। যেন এক ঝাঁক মেঘ বাতাসে ভেসে এসে আড়াল করে নিদাঘের তপন কিরণ। কিন্তু মাটির প্রহরীরা নীরব কেন? কেন এখনও গর্জে উঠছে না এ্যান্টি-এয়ারগানগুলো? একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংরেজ ও তার মিত্র মার্কিন বাহিনী কি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়েছে? এর আগে যেদিন জাপানী বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল কলকাতার আকাশ থেকে—সেই বিমান বহরকে ত তাড়া করেছিল বৃটিশ এয়ার ফোর্সের পাইলট ও সৈন্যরা। আজ তবে কি হল? কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশ। তবে কি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোন অঘটন ঘটে গিয়েছে? অবিশ্বাসের কিছু নেই। ওয়ার সিচুয়েশন যখন খারাপের দিকে যায় তখনও যুদ্ধকালীন প্রচার ব্যবস্থা বিপর্যয়ের কথা বেমালুম চেপে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের, ফ্রান্সের একের পর এক পরাজয় এবং অসাফল্যের মুখেও প্রচারের কারসাজিতে কি ভাবে অরডিনারী স্যাপার ও বেসামরিক জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা হয় প্রচারের ঢাক পিটিয়ে সে অভিজ্ঞতা বিগত ক'বছর ধরে ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের হয়েছে বৈকি। শেষ-পর্যন্ত যখন ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, জাপানী মারের কাছে দাঁড়াতে পারেনি ইঙ্গ-মার্কিনী মিত্রপক্ষ তখন তাদের প্রচারের বুলি পাল্টে যা বলা হয়েছে তা হল সাফল্যের সঙ্গে মিত্রশক্তির পশ্চাদপসরণ। সাফল্য অসাফল্য কে খতিয়ে দেখতে যাচ্ছে—মোট কথা ইংরেজ এশিয়াবাসী মাছ-ভাত-খাওয়া জাপানী সেনাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। ফলে কলকাতায় লেগে গিয়েছিল বেদম ইভাকোয়েশনের হিড়িক। শহর কলকাতার মায়া কাটিয়ে অজ-পাড়াগাঁয়ের আনাচে, কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল এলুম-গেলুম-খেলুম মার্কা ক্যালকেশিয়ান 'ড্যাম চি' বাবুরা।

এই সব ভাবতে ভাবতে সত্যপ্রকাশ আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল

বুলিয়ে দেখলেন যে, সেই শ্বেত পারাবতের মত এরোপ্লেনগুলো দূরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। মাঝে মাঝে প্লেনগুলো থেকে প্যারাসুট-এর ছাতা নেমে পড়তে দেখা যাচ্ছে। তবে কি এর পেছনে কোন গূঢ় রহস্য আছে! সেই যে সেদিন ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশ সেবারে ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায় সতর্কতার সঙ্গে দরজা-জানালা বন্ধ করে সেই তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন......

"প্রত্যেকটি ভারতবাসী মর্মে মর্মে জানে সেই প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে বৃটিশ রাজনীতিবিদরা তাদের স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়ে কি নির্মমভাবে ছিনিমিনি খেলছেন। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি তারা চায় না। তারা জানে বৃটিশ শাসকরা চতুর আর ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্। তারা স্বাধীনতার আশ্বাস দেন, প্রতিশ্রুতি দেন আর নির্বিকারে ও নির্লজ্জের মত সেই প্রতিশ্রুতির কথাগুলো ভুলে যেতে পারেন। তাই ভারতীয়রা স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন, বর্বর দস্যুবৃত্তি দুর্নীতি আর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার অবিচার দিয়ে তিলে তিলে গড়া বৃটিশ রাজত্বকে সমূলে উৎপাটিত করতে।

"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ"

ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের কানে বাজে জাপানের রাজধানী শহর টোকিওর জনসভায় জাপানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর উক্তি— India for Indians. নেতাজী সুভাষ সেই ঐতিহাসিক উক্তির সন্ধিক্ষণে বলেছিলেন 'It will go down in history as the prophetic utterence of a far-seeing statesman.'

সত্যপ্রকাশের কানে বাজে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বা জাপানীদের ভাষায় চন্দর বোস-এর ১৯৪২-এর ২৩ শে এপ্রিল তারিখে গভীর নিশীথে রেডিও মারফৎ বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর—

Japan is our allys, our helper. My appeal to the

Indians in Malaya, Thailand, Burma and East Asia, to make their full share of sacrifice in the fight for freeing their Motherland.

সত্যপ্রকাশের মনে প্রশ্ন জাগে তবে কি ঐ শ্বেত কপোত সদৃশ বিমানগুলির সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোন সম্পর্ক আছে? ও কি তবে সুভাষচন্দ্রের মিত্র জাপানের সহায়তায় পরাধীনতা শৃঙ্খল হতে ভারত মুক্তির বাণী বাহক শ্বেত কপোত! যদি তাই হয়—তবে...তবে..তবে ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশের মন একটা ভাললাগা অনুভূতিতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কত রঙীন স্বপ্ন মনের আকাশে রামধনুর সপ্ত রঙের মত যেন আলোর ও আশ্বাসের বাণী ছড়ায়। তবে কি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী কোন অঘটন ঘটিয়ে বসল? তবে কি সেই দিন আর দুরাগত নয় যেদিন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর বৃটিশ সিংহ লাঙ্গুল গুটিয়ে গর্বোদ্ধত ইউনিয়ন জ্যাক গুটিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক তল্পিতল্পা বেঁধে পাড়ি জমাবে ইংলণ্ডের পথে!

তবে কি 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে—কত প্রাণ হল বলিদান' সেই শতশত মুক্তি পাগল বিপ্লবীদের রক্ত রঞ্জিত পথে ভারত মুক্তির দুর্বার আই. এন. এ. বাহিনী বৃটিশ ইণ্ডিয়ার কোন অংশ থেকে কদম কদম পা ফেলে নেতাজীর দিল্লী চলো আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্য-সত্যই এগিয়ে আসছে! এগিয়ে আসছে কি তারা বীরপদক্ষেপে? তাদের বিউগিল-এ মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে কি মুক্তি-বার্তা? যদি তাই হয়, সত্যসত্যই যদি সুভাষচন্দ্র কোন অঘটন ঘটিয়ে থাকেন, যদি সত্যসত্যই তাঁর সেনাবাহিনী আসাম সীমান্ত দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে থাকে তবে দেশবাসী আপামর জনগণের মধ্যে কি অভূতপূর্ব অনাবিল অফুরন্ত আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে না? তাদের ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় কি শুরু হবে না শৃঙ্খল মোচনের রক্তনাচন। এমনি সব ভাবতে ভাবতে সবিস্ময়ে যেন ঐতিহাসিক সত্যপ্রকাশ দেখলেন······

বীর পদভারে মেদিনী কম্পমান। ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চল পার হয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীর সেনামণ্ডলী রণদামামার তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য তাদের বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক কলঙ্কিত ইংরেজের কুক্ষিগত ভারতের রাজধানী দিল্লী। দিল্লী দুর অস্ত্। তবু দিল্লীর দিকে তারা ধাবমান, কেননা দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।

সৈনিকদের পদভারে গোধূলির মত পথের ধুলা আকাশে উড়ছে। বন জঙ্গল পাহাড়-পর্বত পার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ। নেতাজীর নির্দেশ, নেতাজীর আহ্বান —চলো দিল্লী। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে নেতাজীর সেই ঐতিহাসিক আহ্বান—

"তোমাদের রণধ্বনি হোক ; দিল্লী চলো, চলো দিল্লী। ···শেষে জয়ী আমরা হবোই। ···তোমাদের এই আশ্বাস দিলাম যে, আলোয় বা অন্ধকারে, দুঃখে ও হর্ষে, শোকে ও জয়গর্বে আমি তোমাদেরই সাথী হবো। আজ তোমাদের কাছে দেবার মতো আমার কিছুই নেই ; শুধু ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, দুর্গম পথ, অজস্র মৃত্যু। তোমরা একটি পতাকা ঘিরে দাঁড়াও, ভারতের মুক্তির জন্য আঘাত হানো। ...দূরে, বহুদূরে নদনদী ছাড়িয়ে অরণ্য-পর্বত ছাড়িয়ে ঐ আমাদের মাতৃভূমি। ...দেখ, দেখ, তোমাদের সামনে স্বাধীনতার পথ। ...ভগবান যদি চান আমরা শহীদের মত মৃত্যু বরণ করব। যে পথ ধরে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লী পৌঁছবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময়ে আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করে নেব। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী।"

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ এগিয়ে চলেছে দিল্লীর দিকে। লক্ষ্য তাদের লাল কেল্লা। লাল কেল্লা প্রাকারে উড্ডীয়মান বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের নিশানা ঐ ইউনিয়ন জ্যাককে ঘৃণাভরে নামিয়ে

দিতে হবে, সেই স্থানে ওড়াতে হবে ভারতের তিন রঙা জাতীয় পতাকা। এগিয়ে চলেছে নেতাজী নির্দেশিত পথে ভারত মাতার সৈনিকবৃন্দ।

ঐ দূরে দেখা যায় মণিপুরের পাহাড়রাজি, ঐ দেখা যায় ইম্ফলের ঘনসন্নিবিষ্ট অরণ্যানি। ঐ সীমানায় পাতা-রঙা শিরস্ত্রাণ পরিহিত বৃটিশ-আমেরিকার দম্ভ রক্ষার দালাল সৈনিকরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের রণ-সাধ চূর্ণ করে এগিয়ে যেতে হবে। অপূর্ব অটুট মনোবলে বলীয়ান আজাদ হিন্দ সৈনিকরা এগিয়ে চলেছে লক্ষ্য অভিমুখে। ঐ ঐ আবার শোনা যায় নেতাজীর দৃঢ়কণ্ঠ—

"আমি চিরদিন আশাবাদী। পরাজয় বরণ করা আমার ধাতে সহে না, কোনদিনই আমি পরাজয় বরণ করি নাই। ...নিশান্তে সূর্য্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। ...ইম্ফলের সমতল ক্ষেত্রে আরাকানের দুর্ভেদ্য অরণ্যে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি সন্নিকটের ভীষণ সংগ্রামে তোমরা বীরত্বের গৌরব নিশান উড্ডীন করিয়াছ। ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। ভাইসব, বন্ধুসব, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা চিরোজ্জ্বল বর্ণে স্বর্ণ মসীতে লিখিত থাকিবে।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।
জয়হিন্দ।"

নেতাজীর কণ্ঠনিঃসৃত বাণীতে উদ্বুদ্ধ সৈনিকবৃন্দ এগিয়ে চলেছে। গন্তব্যস্থল তাদের দিল্লী। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।

উত্তাল আলোড়নে উদ্বুদ্ধ তখন মালয়, থাইল্যাণ্ড, সোনান ও পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মন। তারা শুনেছে জাপান রেডিও থেকে প্রচারিত ভারতের মুক্তিদূতের সেই ঐতিহাসিক কণ্ঠ।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের মনে এক

অভূতপূর্ব জাগরণ। দলে দলে তরুণরা যোগ দিচ্ছে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে, নারীরা খুলে দিচ্ছে প্রাণের প্রিয় অলঙ্কার। ব্যবসায়ীরা যে যা সঞ্চয় করেছে, সবই নেতাজীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করছে। সবারই স্বপ্ন-সাধ—স্বাধীনতা!

এগিয়ে চলেছে অপূর্ব বিক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজ। মণিপুরে অরণ্যশোভিত সীমান্তে তারা বৃটিশের সমর সাধ নির্মূল করে দিয়েছে। এগিয়ে চলেছে তারা দিল্লীর দিকে। আকাশে বাতাসে পথে-প্রান্তরে নেতাজীর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে "দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।" বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে আজাদ হিন্দ বাহিনী। বৃটিশের প্রথম রক্ষাব্যূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পলায়নপর শৃগালের মত তারা পেছু হটছে। বৃটিশ সিংহ গুটিয়েছে তার লাঙ্গুল।

ড্রাম-বিউগ্‌ল-এর তালে তালে বাজছে যুদ্ধ সঙ্গীত—

কদম কমদ বাঢ়হায়ে যা
খুশীসে গীত গায়ে যা।

কদম কদম পা ফেলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর হিন্দু-মুসলিম, শিখ-খৃষ্টান সৈনিকরা এগিয়ে চলেছে দিল্লীর দিকে।

হতমান পরাজিত ইংরাজের শিবিরে শিবিরে বেজে চলেছে যেন শেষ বিদায়ের সঙ্গীত। চন্দর বোস যে তাদের সূর্য অস্ত না যাওয়া সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে এমন ভাবে ধূলায় লুটিয়ে দেবে—এ কথা কল্পনায়ও তারা স্থান দিতে পারেনি।

দিল্লীর লাট-ভবন ছেড়ে বৃটিশ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিশেষ বিমানে গভীর রাত্রিতে এসে হাজির হলেন জহরলাল নেহেরুর বাড়ীতে। জানালেন অকপটে যুদ্ধের এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা।

—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! তোমাদের বিশ্ববিজয়ী সেনানীরা সুভাষের সামান্য এ্যামেচার সেনাদের রুখতে পারছে না? বিস্মিত নেহেরুর উক্তি।

ওয়াভেল—কি করব বল। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে যে

অঞ্চলে যুদ্ধ হবে সেখানকার বেসরকারী লোকদের আনুগত্য চাই। যে ওয়েভ থেকে চন্দর বোস তার শেষ মেসেজ দেয়—সে ওয়েভ আমরা ডিস্টার্ব করতে পারিনি। আসাম, নর্থ বেঙ্গল, মণিপুরের লোকরা সেই আহ্বান শুনে বুঝতে পেরেছে যে ইওর নেটিভ ম্যান চন্দর বোস সেনাবাহিনী গঠন করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই কথা জানতে পেরেছে বলে তারা সব রকমে নন-কোঅপারেশন করছে। আমরা যে সকল কনভয় পাঠাচ্ছি তা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া একথা আমাদের ইণ্ডিয়ান সোলজারদেরও প্রভাবিত করছে। দুই কোম্পানী সোলজার প্রকাশ্যে রিবেল করেছে।

নেহেরু—তবে এখন উপায়? সুভাষ যদি এসে যায়, তবে আমরা অর্থাৎ গান্ধী গ্রুপ কি কোনদিনও আর পাওয়ার-এ আসতে পারব? সুভাষ বলেছে ভারত গঠনে প্রথমে প্রয়োজন ডিক্টেটরশিপ। তার মানে কোনদিনই তাকে সরানো যাবে না।

ওয়াভেল—তা হামি কি করবে মিঃ নেহেরু। তোমার দেশের লোক যখন হামাদের চায় না, তখন আমরা আগামী কাল থেকে ইভাকুয়েট করতে বলব বৃটিশ নাগরিকদের।

নেহেরু—কিন্তু যা-ই কর না কেন একবার বাপুজীর সঙ্গে পরামর্শ না করে......।

ওয়াভেল—কিন্তু বাপুজী কি বলবে না বলবে তা শুনে কি বৃটিশদের মাস-স্লটারিং বন্ধ করা যাবে? আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখুনিই করতে হবে। সব জাহাজ, এ্যারোপ্লেন সীজ করে ওদের কোন মিত্ররাষ্ট্রে পাড় করে দিতে আরম্ভ করতে হবে।

নেহেরু—প্লিজ, মিঃ ওয়াভেল, একবার অন্ততঃ বাপুজীর কাছে চল।

ওয়াভেল—বেশ, বলছ যখন, চল। কুইক, কুইক মেক হে মিঃ নেহেরু।

নেহেরু—কিন্তু আমার গায়ে যে স্লিপিং স্যুট।

ওয়াভেল—মিঃ নেহেরু, তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। আমরা তোমাদের ইণ্ডিয়ানদের মত ডিজঅনেষ্ট নই। আমরা যদি বৃটিশ নাগরিকদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা না করি তবে পার্লামেণ্টে এ নিয়ে দারুণ গণ্ডগোল হবে। এমন কি 'কিংস কমিশন' বসতে পারে। যদি যেতে চাও ঐ পরেই চলে এসো। আমাদের এখনই এয়ার ফোর্সের প্লেনে চাপতে হবে।

গভীর রাত্রিতে ওয়ার্ধার শান্ত কুটিরে মিলিটারী জীপের কর্ণ বিদারী আওয়াজে কুকুরদের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা ঘেউ ঘেউ শব্দে পাড়া মাথায় করে তুলল। লর্ড ওয়াভেলের দেহরক্ষীরা কুকুরগুলোকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বলে—দে আর বার্কিং জাষ্ট লাইক ইণ্ডিয়ানস্।

অতঃপর নেহেরু জীপ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে কোনক্রমে কুকুরগুলোকে থামিয়ে গান্ধীজীর কুটিরে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গালেন। ওয়াভেল ততক্ষণে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ তুলে দোরে এসে পৌঁছে গিয়েছেন।

সদ্য ঘুমভাঙ্গা গান্ধীজী সামনে লর্ড ওয়াভেলকে দেখে চম্‌কে ওঠেন। বোঝেন যে ব্যাপার বড় গুরুতর। সঙ্গে সঙ্গে শুধান—ব্যাপার কি, এত রাতে হঠাৎ আপনারা।

লর্ড ওয়াভেল—মিঃ গান্ধী, ওয়ার সিচুয়েশন খুব খারাপ। চন্দর বোসের আই. এন. এ. আসামের মধ্যে দিয়ে টুয়ার্ডস বেঙ্গল মার্চ করছে।

গান্ধীজী—কি আশ্চর্য! আপনাদের বিখ্যাত বৃটিশ বাহিনী ওদের বাধা দিতে পারছে না। আমরা যে তবে পথে বসব মিঃ ওয়াভেল।

ওয়াভেল—সরি মিঃ গান্ধী, আমরা পিপল্-এর কোনরকম কো-অপারেশন পাচ্ছি না। এতদিন চন্দর বোসের 'রেডিও কল'গুলোর ওয়েভে ডিস্টার্বেন্স ঘটিয়ে বাধা দিলেও 'লাষ্ট কল'কে বাধা দেওয়া

যায় নি। কোথা থেকে কি করে যে ওই 'কল' আসাম আর নর্থ বেঙ্গলের রেডিওতে ধরা পড়ল, তা বুঝতে পারছি না। ফলে আমাদের মিলিটারী মুভমেণ্টের বিরুদ্ধে বাধা দিচ্ছে জনতা। এমন কি দু'তুটো কনভয় ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। জানি না চন্দর বোস কোন শক্তিশালী গুপ্তচর চক্রকে পাঠিয়েছে কিনা। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দারা এ সম্পর্কে কোন খবর দেয় নি। শুধু উড়িষ্যা কোষ্ট-এ নামা আই. এন. এ. স্পাইদের সম্পর্কে ইনফরমেশন সংগ্রহ করেছিল।

গান্ধীজী—তা হলে এখন উপায় ? প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে সুপরিচিত ভঙ্গিতে গান্ধীজী অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন।

নেহেরু—বাপুজী, কি হবে। তবে কি সুভাষের হাতেই পাওয়ার চলে যাবে।

গান্ধীজী—(ধমকে) যাবে না ত' কি তোমাদের হাতে থাকবে ? পাওয়ার কি দিল্লীর লাড্ডু ? পাওয়ার পড়ে পাওয়া যায় না—গেইন করতে হয়। সুভাষ যদি পাওয়ার পায় তার যোগ্যতাবলেই পাবে। আমরা ভেবেছিলাম—আমাদের গ্রুপ ওঁৎ পেতে থেকে পাওয়ার লুফে নেব। কিন্তু সে জন্য চুপ করে বসে থাকেনি সুভাষ। সে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি ওয়ার প্রিজনারদের নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করা সোজা কথা নয়।

ওয়াভেল—মিঃ গান্ধী, আমি তবে যাই। অনেক দায়িত্ব আমার মাথায়। বৃটিশ নাগরিকদের সেফেস্ট জোন-এ নিয়ে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

গান্ধী—কিন্তু পাওয়ার-এর কি হবে।

ওয়াভেল—ও ব্যাপার নিয়ে আমরা, বিদেশীরা কেন মাথা ঘামাব মিঃ গান্ধী, আপনাদের ইণ্ডিয়া আপনাদের থাকল। পাওয়ার কে পাবেন না পাবেন তা আপনারা, ইণ্ডিয়ানরা ঠিক করুন।

গান্ধী—আর কোন উপায়ই কি নেই মিঃ ওয়াভেল ?

ওয়াভেল—বলুন, কি উপায় আছে ?

গান্ধী—ধরুন আপনারা যদি রাতারাতি আমাদের হাতে পাওয়ার দিয়ে দেন, তা হলে সুভাষের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান আর্মি যদি মোবিলাইজ করাই আর তাদের সঙ্গে থাকে বৃটিশ-আমেরিকান আর্মি।

ওয়াভেল—কি বলছেন মিঃ গান্ধী ! (আপনি না অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, আপনি সৈন্য মোবিলাইজ করাবেন, তাও আবার কোন ইণ্ডিয়ানের বিরুদ্ধে ! হাঃ হাঃ হাঃ মিঃ গান্ধী, পলিটিক্স বড় বিচিত্র জিনিষ। যাক আমি চলি। সো লং মিঃ গান্ধী, সো লং মিঃ নেহেরু, বাই বাই !)

লর্ড ওয়াভেল ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। একটু পর তাঁর জিপের শব্দ মিলিয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে সুপরিচিত ভঙ্গিতে বসে আছে জহরলাল নেহেরু আর গান্ধীজী যেন বোবার মত বসে থাকেন যাকে সরল ইংরাজীতে বলে 'স্ট্রাকডাম্ব'! এমনি ভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ গাড়ীর শব্দ হল বাগানে। ক্ষণ পরে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন সর্দার প্যাটেল। উৎফুল্ল স্বরে বললেন—

প্যাটেল—বাপুজী, শুনেছেন, আমাদের আই. এন. এ. মার্চ করে আসছে।

গান্ধী—কে, কে এ খবর দিল তোমায়, সর্দার ?

প্যাটেল—আমার এক আত্মীয় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলট, সেই।

গান্ধী—কিন্তু এতে তুমি এত উৎফুল্ল কেন সর্দার ?

প্যাটেল—কেন বাপুজী, আমরা ত ইংরেজকে তাড়াতেই চাই। তাই ত 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব নিয়েছি।

গান্ধী—তা নিয়েছি। জানই ত এ শ্লোগান আগে দেয় সুভাষ ; আমরা যে তখন 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' পেলেই খুসী ছিলাম। কিন্তু দেশের লোক বিগড়ে যাবে দেখে বাধ্য হয়ে কুইট ইণ্ডিয়া শ্লোগানের ছুঁচো গিলেছিলাম। বৃটিশ এখুনি চলে গেলে কি অবস্থা হবে জান ? যাদের কব্জির জোর আছে তারা পাওয়ার লুফে নেবে। কিন্তু আমরা

ত' কব্জির জোর তৈরী করি নি বৃটিশকে তাড়াতে, আমরা করেছি হাতজোড়। তাই বৃটিশ বিলিবণ্টন না করে চলে যাক, এ আমরা চাই নি। এই জন্যেই ত' আমাদের মনোভাব বুঝে মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্না প্যাঁচ কষছে।

সর্দার প্যাটেল—কিন্তু বাপুজী, সুভাষ সে জাতের নয়। সত্যিই দেশের স্বাধীনতার জন্য ও কী না করেছে। যখন কিছুতেই আপনাকে মতে আনতে পারল না—নিতান্ত বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ল। হের হিটলারের সঙ্গে দেখা করে আই. এন. এ. গড়ার কঠিন কাজে হাত লাগালো আর জাপান প্রবাসী রাসবিহারী বসু ওঁকে এনে সর্বাধিনায়ক করে দিলেন। সত্যিই ও সর্বাধিনায়ক হবার যোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও যদি দিল্লীর বড়লাট ভবনে আই. এন. এ-র পতাকা ওড়ায় তবে দেশের ভার নেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করবে। সুভাষ আর যাই হক 'মিন' নয়।

এম, কে, গান্ধী—ঐ আনন্দেই থাক সর্দার। সুভাষ যদি আসে তবে জনসাধারণের মধ্যে যে কী অভূতপূর্ব উল্লাস উত্তাল হয়ে উঠবে, তা তোমরা কল্পনাতেও আনতে পারছ না।

প্যাটেল—যাই বলুন বাপুজী, সুভাষের রেডিও আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি আপনি দেশবাসীকে বৃটিশ বিরোধী উত্থানে ডাক দিতেন, তা হলে এতদিনে স্বাধীনতা এসে যেত। আর সুভাষের ক্রেডিট আমরা সকলে ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম।

এম, কে, গান্ধী—কিন্তু কেন যে তা করি নি। সুভাষ বাঙালী এ কথা ভুলে যেও না। বৃটিশের পরেই প্রায় সকল প্রশাসনিক ক্ষেত্রের বস্‌ই বাঙালী। ওরা ভারতের সব চেয়ে চতুর জাতও। ওরা যদি একবার ভারত শাসনের ক্ষমতা পায়, তা হলে আর কোন দিনও কি তোমরা পাওয়ার হ্যাণ্ডল করার সুযোগ পাবে?

প্যাটেল—আপনি যা ভাবছেন, তা ত' না-ও হতে পারে। বাঙালী, বাঙালীর জন্য আর কতটুকু ভেবেছে বলুন, সব সময়ই ওরা ভারতের কথাই ভেবেছে। তা যদি না ভাবত, তবে সারা ভারতের

ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সবকিছু ওরা কুক্ষিগত করে ফেলতে পারত।

মোঃ কঃ গান্ধী—সেটা পারেনি ব্যবসা বুদ্ধিতে ওরা খুব খাটো বলে।

প্যাটেল—কিন্তু ঠাকুর ফ্যামিলির কথা কি ভুলে গেলেন মহাত্মাজী, ওদের যা কিছু আর্থিক প্রতিপত্তি তা ত' সফল ব্যবসায়ী হিসাবেই।

মোঃ কঃ গান্ধী—কিন্তু তারপর কি দেখলে, ওদের ফ্যামিলি সাহিত্য আর সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকলো। ও সব কথা থাক, সুভাষ যদি চলে আসে তবে আমাদের গ্রুপ-এর কি করণীয় হবে তাই ঠিক কর।

প্যাটেল—তা হলে আমাদের একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডাকতে হয়।

নেহেরু—মিটিং ফিটিং ডেকে কি হবে? কংগ্রেস মানেই বাপুজী, বাপুজী মানেই কংগ্রেস। যা সিদ্ধান্ত নেবার ওঁকেই নিতে দিন এখন।

মোঃ কঃ গান্ধী—তুমি থাম ত জহর, এতদিনের কংগ্রেস আর আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এক নয়। সুভাষ যদি সত্যিই লালকেল্লা দখল করে তবে কংগ্রেসের যা কিছু অবদান, সবই জনতা মন থেকে মুছে ফেলবে। তখন ওদের দৃষ্টিতে সুভাষই হবে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা বা ফুয়েরার—যে কথা হের হিটলার ওকে 'রিসিভ' করার সময় উচ্চারণ করেছিল তাই-ই বর্ণে বর্ণে সত্য হবে দেখবে।

: ঠিকই অনুমান করেছেন আপনি গান্ধীজী!

অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ একটি বলিষ্ঠ মূর্তি যেন এগিয়ে এলো! গান্ধীজীর দিকে চেয়ে বলতে লাগল—

: আমি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, বহুমানভাজন সুভাষচন্দ্র বসুর নিজস্ব ইণ্টেলিজেন্স-এর এক স্পেশাল অফিসার।

নেতাজীর নির্দেশ—এই বার্তা পৌঁছে দেবার সময় থেকে আপনি পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সকল দেখা-সাক্ষাৎ এবং গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত রাখুন।

: কিন্তু, কিন্তু বাপুজীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করাটা কি সুভাষের পক্ষে……

উত্তেজিত জহরলাল বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাকে শেষ করতে না দিয়েই আগন্তুক বললেন—

: অবস্থা গতিকে অনেক সময় অনেক অপ্রীতিকর কাজ মানুষ করতে বাধ্য হয় জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনে। তা ছাড়া এখন যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির আদেশ আপনাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তখন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে আপনাদের সামনে কোন দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

উত্তেজিত জহরলাল বলতে যান…

: কিন্তু আমরা যদি তাঁর হুকুম না মানি…

: তবে আমাদের যে সশস্ত্র ইণ্টেলিজেন্স গার্ডরা ওয়ার্ধার আশ্রম ঘিরে ফেলেছে তারা জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে আপনাদের সে হুকুম মানতে বাধ্য করবে।

: আঃ জহর, তুমি থামবে ?

গান্ধীজী ধমক দিলেন জহরলালকে। আগন্তুকের দিকে বলতে থাকলেন—

: অফিসার, আপনি সুভাষকে…

আগন্তুক গান্ধীজীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল—

: আমি দুঃখিত, আপনি যখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রেসিডেণ্টের নাম উল্লেখ করছেন, তখন যথাযথ সম্মানের সঙ্গে কথা বলুন।

: মেক পার্ডন অফিসার, আমি সুভাষকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতাম বলে…

: গান্ধীজী, আমি জানি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,

জানি সেই ইতিহাস যখন কংগ্রেস থেকে আপনার প্রশ্রয়েই মাননীয় সর্বাধিনায়ককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সুকৌশলে। তাও তিনি কিন্তু আপনাকে ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই তারিখে—বেতার বক্তৃতায় আপনার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—কথা বলতে বলতে আগন্তুক তাঁর কামিজের পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে পড়ে যায়—

"ভারতের বাইরে যে সব ভারতীয় রয়েছেন তাঁদের কাছে পদ্ধতির অনৈক্য পারিবারিক অনৈক্যেরই সমান। লাহোর কংগ্রেসে ১৯২৯ সালে আপনি যখন ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব করেছিলেন তখন থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সকল সভ্যের ঐ একই লক্ষ্য। আপনিই যে ভারতীয় নব জাগরণের মূল একথা ভারতের বাইরের ভারতীয়রা জানে। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে আপনার "ভারত ছাড়" প্রস্তাব ঘোষণার পর তাদের শ্রদ্ধা আপনার উপর আরো অনেক বেশী বেড়ে গেছে।

মহাত্মাজী, আমরা যদি বৃটিশ জনগণকে তাদের গভর্ণমেণ্ট থেকে আলাদা করে দেখি তবে আমাদের মস্ত বড় ভুল হবে। বৃটেনে একদল আদর্শবাদী লোক আছেন যাঁরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী, বৃটেনের লোকেরা এই সব লোকেদের পাগল বলে থাকে! বৃটিশ জনগণ তাদের গভর্ণমেণ্টের সাথে সাধারণতঃ ভারত সম্পর্কে একমত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, মার্কিন শাসন-পরিচালকরা সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁরা প্রকাশ্যভাবেই মার্কিন শতাব্দীর কথা বলতে শুরু করেছেন।

মহাত্মাজী, আপনি বিশ্বাস করুন এ কঠিন যাত্রাপথের আগে আমি এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। দেশবাসীর প্রতি সেবা করবার পর তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হবার ইচ্ছা আমার কখনও ছিল না। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম যে, আমাকে যেন কেউ বিশ্বাসঘাতক বলার সুযোগ কখনও না পায়। আমার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেশবাসীর দয়া ও গুণে ভারতের দেশকর্মীর শ্রেষ্ঠ সম্মান

আমি লাভ করেছি। বাইরে না এলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে এ বিশ্বাস যদি আমার এতটুকুও থাকত, তাহলে আমি দেশের এ চরম সঙ্কট মুহূর্তে কখনও দেশত্যাগ করতাম না। যদি আমি বুঝতে পারতাম যে, আমাদের এই জীবনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের এমনি আর একটি সুবর্ণ সুযোগ পাব তাহলে আমি দেশত্যাগ কিছুতেই করতাম না।

একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, বৃটিশের মত ধূর্ত কূট রাজনীতিক এ পৃথিবীতে আর নেই। আমরা সারাজীবন ধরে এদের সাথে রাজনৈতিক চাল দিয়েছি, লড়েছি বারবার। সুতরাং তারা জগতের অন্য কোন রাজনীতিক দ্বারা প্রতারিত হবে এ কখনও সম্ভব নয়। বৃটিশ রাজনীতিকরা যখন আমায় তাদের বশে আনতে পারে নি, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তা পারবে না। দেশের সম্মান, আত্মমর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ আমি জীবনে কোনদিনই করিনি। আমি জাপানে এসেছি তখন—যখন জাপান তার জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমেছে অর্থাৎ সে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই স্বেচ্ছায় এ সময়ে জাপানে এসেছি।

মহাত্মাজী, আপনি জানেন ভারতীয়েরা কখনও শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে না। সুতরাং আপনি জানবেন, জাপানীদের মুখের কথায় আমিও ভুলবো না।

মহাত্মাজী, আমি এবার আমাদের সামরিক সরকার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমরা যে এখানে আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য হল অস্ত্রের সাহায্যে ভারতকে বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত করা। ভারত থেকে বৃটিশদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করবার পর এই সামরিক সরকারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সব কিছু দুঃখ, কষ্ট ও আত্মত্যাগের একমাত্র পুরস্কার চাই জন্মভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভারতের অভ্যন্তরে যে সব ভারতীয়রা বাস করছেন তাঁদের

সমবেত নিজ চেষ্টায় যদি দেশ স্বাধীন হয় কিংবা আপনার "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুসারে যদি বৃটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের চেয়ে বেশী সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এগুলোর কোনটাই সম্ভব হবে না। ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এখন ভারতভূমিতেই যুদ্ধ করছে এবং তারা ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে ভারতের আরও অভ্যন্তরে অগ্রসর হচ্ছে। যতক্ষণ নয়াদিল্লীর বড়লাট ভবনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা না উড়ছে এবং যতদিন পর্যন্ত সব ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে চলে না যাচ্ছে, আমাদের এ সংগ্রাম থামবে না।

মহাত্মাজী, আপনি আমাদের জাতির পিতা, তাই ভারতের এই পবিত্র মুক্তি সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"

পড়া শেষ করে আগন্তুক গান্ধীজীর দিকে চেয়ে বলে—

: কিন্তু মহাত্মাজী, আপনি সর্বাধিনায়কের সে আহ্বানে সাড়া দেন নি। নিজ আশীর্বাদে উদ্বুদ্ধ করেন নি জাতিকে। যদি করতেন তবে কাজ সহজ হতো।

তার কথা শেষ হতে না হতেই একজন সৈনিক বাইরের দিক থেকে এসে আগন্তুকের উদ্দেশ্যে স্যালিউট দিয়ে দাঁড়ায়।

: কি খবর, সিক্রেট সার্ভিসের কোন গোপন খবর আছে কি ?

: অফিসার, আজ গভীর রাত্রে ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল মিঃ ওয়াভেল গোপন পরামর্শের জন্য এখানে এসেছিল।

: ঠিক আছে, আমাদের সিক্রেট সার্ভিস ইংরেজ রাজপুরুষদের এবং তাদের বিশ্বস্ত ভারতীয় এজেণ্টদের উপর নজর রেখেছে।

: আমি তবে যাই স্যার ?

: আচ্ছা যাও।

সৈনিক স্যালিউট দিয়ে প্রস্থান করলে আগন্তুক আই. এন. এ. অফিসার গান্ধীজীকে বলল—

: আপনি ত সর্বাধিনায়কের সেদিনের আহ্বানে সাড়া দেননি, উপরন্তু আপনার উত্তরাধিকারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছিলেন এবং নেতাজীকে কুইসলিং বা দেশদ্রোহী এবং 'জাপানের চর' বলে প্রতিপন্ন করে নিজের দর বাড়িয়েছিলেন ইংরেজের কাছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—

: যা হবার হয়ে গেছে অফিসার, আমি সেজন্য দুঃখিত। আপনার সর্বাধিনায়কের আদেশ এবার আমি মেনে চলবার চেষ্টা করব।

: আপনার অনুগামীদের বলে দেবেন মহাত্মাজী, ইংরেজের 'ইণ্টেলিজেন্স রিপোর্ট'-এ যে সব নেতাদের সম্পর্কে কোনরূপ স্বাধীনতা বিরোধী মন্তব্য পাওয়া যাবে না, তাদের বিষয় পরিবর্তিত অবস্থায় অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।

কথা শেষ করে আগন্তুক আই. এন. এ. অফিসার প্রস্থান করে ওয়ার্ধার আশ্রম থেকে। একটু পরে তার জীপের শব্দ মিলিয়ে গেলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন—

: বাপুজী, লর্ড ওয়াভেলের খবর তা হলে মিথ্যা নয়।

: কিন্তু, অল ইণ্ডিয়া রেডিও-তে ইংরেজের নির্দ্ধারিত প্রোগ্রাম কি করে এখনও ব্রডকাষ্ট হচ্ছে?—জানতে চান পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

: সব কাজই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করছে আই. এন. এ.। মনে হয় ইংরেজ নাগরিকদের মাস স্লটারিং চায় না সুভাষ। সর্দার, ইংরেজ যখন বুঝেছে যে, আর সুভাষকে বাধা দেওয়া নেক্সট টু ইম্পসিব্‌ল, তখনই ইংরেজ নাগরিকদের ইভাকুয়েট করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

ধীর স্বরে বলেন গান্ধীজী।

: বাপুজী, তা হলে শেষ পর্যন্ত সুভাষের হাতেই ক্ষমতা চলে গেল!

হতাশ কণ্ঠে বলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

: আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে। সুভাষের সদিচ্ছার উপর নির্ভর না করে কোন উপায় দেখছি না।

পূবের আকাশে তখন তরুণ তপনালোক হেসে উঠেছে। এ সূর্য স্বাধীনতার সূর্য, এ সূর্যালোকে নেই কোন মালিন্য। প্রকৃতির প্রান্তে প্রান্তে যেন নতুন প্রাণস্পন্দন! পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে নতুন এক সঙ্গীত—যে সঙ্গীত মাতৃ বন্দনার।

ওয়ার্ধা আশ্রমের রেডিও যন্ত্রে ভাল্ব জ্বালিয়ে রাখা হল লর্ড ওয়াভেল এবং আই. এন. এ. সিক্রেট সার্ভিসের স্পেশাল অফিসারের নির্দেশ কতটা বাস্তবসম্মত তা খতিয়ে দেখবার জন্য। এখনও গ্রুপের মনে ক্ষীণ আশা, যদি শেষ পর্যন্ত ইংরেজ অসাধ্য সাধন করে। যদি আই. এন. এ.-র সমরসাধ ঘুচিয়ে দিতে পারে তবে যুদ্ধকালে ইংরেজের পক্ষে থাকবার পুরস্কার হিসাবে নিশ্চয়ই পাওয়ার দিয়ে যাবে তারা তাদের হাতে।

কিন্তু না, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রেডিওর প্রোগ্রাম শুরু হল। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষিত হল মরকত মণির মত মহামূল্যবান বাণী—

: বন্দেমাতরম্। আজাদ হিন্দ রেডিও, দিল্লী। স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের সেনাবাহিনীর সমরসাধ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তিকামী সৈনিকরা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সিক্রেট সার্ভিস এমন সুকৌশলে সারা দেশের সেনা ছাউনিগুলোর মধ্যে নিজস্ব সেল তৈরী করেছিল—যার দ্বারা বৃটিশের লালমুখো গোরা সৈনিকদের দুর্বার প্রতিরোধ বৃটিশেরই সেনাবাহিনীর অন্তর্গত বিদ্রোহীদের দ্বারাই নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ইংরেজ গভর্ণর মিঃ ওয়াভেল এবং সেনা প্রধান অকিনলেক আই. এন. এ. বাহিনীর হাতে বন্দী।

এই পরিস্থিতিতে নেতাজীর নির্দেশ (১) বেসামরিক বৃটিশ

নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে কোন রকম বাধা দেওয়া হবে না।

নেতাজীর নির্দেশ (২) সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে চলতে থাকবে। এ বিষয়ে আই. এন. এ. সিক্রেট সার্ভিসের নেতাজীর পাঞ্জা প্রদর্শনকারী বিশ্বস্ত অফিসাররা যেখানে যেমন নির্দেশ দেবে তা অক্ষরে অক্ষরে সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে কার্যকরি করতে হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৩) পুলিশ প্রশাসনকে সমগ্র দেশের মানুষের বন্ধু হিসাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৪) ইণ্টেলিজেন্স-এর অফিসার এবং দেশপ্রেমিক কর্মচারিদের জানানো যাচ্ছে যে আজ সরকারি কাজের সময়ে প্রত্যেক ভারতীয় নেতার রিপোর্টে পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে তা যথাযথ সুরক্ষিত স্থানে রাখতে হবে এবং সকলের উপস্থিতিতে অফিসার ইন চার্জ-এর সইসহ তা সীল করে রাখতে হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৫) আজ কার্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে আজাদহিন্দ ব্যাঙ্ক-এর অফিসার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যিক প্রধান কার্যালয়ের সকল চার্জ বুঝে নেবে। আপাততঃ সকল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নতুন কারেন্সীর ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ ভারতীয় নোটে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর অনবলেপনীয় ছাপ মেরে দিতে হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৬) আগামী সাতদিনের মধ্যে সকল ১০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার নোট আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে যথাযথ রসিদ নিতে হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৭) বিমান বন্দরের ও অন্যান্য স্থানের কাস্টম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে বিদেশী বা দেশী সকল যাত্রীকেই যথাযথ তল্লাসী করে যেন পাশপোর্ট ছাড়া হয়। বিদেশী যাত্রীদের কারও সঙ্গে উর্দ্ধপক্ষে ৫০০ টাকার বেশী মুদ্রা

নেওয়া চলবে না।

নেতাজীর নির্দেশ (৮) পরিবর্তিত অবস্থায় দেশের সকল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করা যাচ্ছে।' জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেশ গঠনমূলক সবল সৎ ও মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

নেতাজীর নির্দেশ (৯) সর্বত্র সামাজিক শৃঙ্খলা বা সোস্যাল অর্ডার দেখার দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপর। বিস্তৃত নির্দেশ স্থানীয় সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

নেতাজীর নির্দেশ (১০) আজাদ হিন্দ সরকার চায় স্বাধীনতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমভাবে ভোগ করুক। যদি কোথাও কোন অসন্তোষ বা উদ্দেশ্যমূলক বিদ্রোহের ভাব দেখা যায় তা যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকরা নির্মূল করে দেয়।

আজাদ হিন্দ রেডিও, দিল্লী। নেতাজীর উপরোক্ত ১০ দফা নির্দেশ সকল শাখা রেডিও ষ্টেশন থেকে আঞ্চলিক ভাষায় পুনঃ পুনঃ সম্প্রচারের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। ঘোষণা শেষ হতেই রেডিওতে গম্‌গম্‌ করে উঠলো আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমর সঙ্গীত—

কদম কদম বাঢ়হায়ে যা
খুশীসে গীত গায়ে যা।

জনগণ এতক্ষণ রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে এই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বেতার-বাণী শুনছিল। এবারে জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল আনন্দে উল্লাসে। মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে যেন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরস নিঃসৃত হতে লাগল। পলাশীর প্রান্তরে বেনিয়া ইংরেজ রবার্ট ক্লাইভ ও মীর্জাফর উমিচাঁদ জগৎশেঠদের কূটকৌশলে দু'শত বছর আগে আম্রবীথিকায় যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল—সেই সূর্য যেন আজ এতদিন পর অমলিন কিরণস্নাত করালে ভারতের মানুষ-মানুষী,

পশু-পাখী-বৃক্ষ-লতা-সাগর-প্রান্তর-মরুভূমি ও শ্যামল শস্য ভারাক্রান্ত পল্লী ও জনপদকে। এ সূর্য, এ সূর্যের আলো মানুষের মন থেকে পরাধীনতার গ্লানি যেন মুহূর্তে মুছে দিল।

সর্বপ্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া পড়ল শহর এলাকাগুলিতে। ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকাল কমিটির পরিচিত অপরিচিত নেতা কর্মীরা নেতাজী সম্বর্দ্ধনায় মেতে উঠল। এ ছাড়া কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজ-নৈতিক দলের নেতারাও নিজেদের দেশ ভক্ত প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখল না।

সারাদিন ধরেই রেডিওতে চলল সেই ১০টি নির্দেশ ঘোষণা। কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী, ইম্ফল হতে সিন্ধু বিস্তৃত ভূভাগের কোটি কোটি মানুষের প্রাণে সে এক নতুন উপলব্ধি। অভিনব উন্মাদনা।

গৃহে গৃহে চলল দেশ ত্যাগের পুর্বে নেতাজী-দর্শনধন্য মানুষদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার পাঁচালী। শ্রোতারা যেন উপলব্ধি করতে পারে জ্বলন্ত অঙ্গারের পক্ষেই এ কাজ সক্ষম।

সেই যে প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে রাজপথের উপর অশ্বারূঢ় সুভাষচন্দ্রকে তরুণ ছাত্র বাংলা প্রত্যক্ষ করেছিল—বাঙালীর সেই শৌর্যবীর্যের চিত্রখানি যেন এতদিন পরে মূর্তি পরিগ্রহ করে ফিরে আসছে স্বদেশের বুকে।

পলিতকেশ এক বার্মা ফেরৎ দাদু তার নাতিদের নানা কৌতূহল নিবৃত্ত করছিল। ঘরে ঘরে বালক-বলিকাদের মধ্যে সে কি উন্মাদনা, সে কি আগ্রহ, সে কি প্রচণ্ড কৌতূহল। পারলে যেন তারা এখনই নেতাজীর মত ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে গিয়ে ইংরেজের গায়ে হেনে আসে শেষ আঘাত। দাদু বলছিলেন—

: আমার এক বন্ধু সৈনিকের কাছে শুনেছি আজাদ হিন্দ ফৌজে যে সব ১১ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়ে ছিল, তাদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র এক বালসেনা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে এই বালসেনাদের অবদান বড় কম

নয়। এই সব ছেলেদের ছ-মাস কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রেখে দেওয়া হত। সেইসব পরীক্ষার মধ্যে সহনশীলতা অভিক্ষাটি (Endurance test) অভূতপূর্ব। সাবধান অবস্থায় থাকাকালীন ১৬ ফুট দূর হতে এক সংগে Rifle fire করা হত। কানের ৬ ইঞ্চি দূর দিয়ে গুলি চলে যেত। যদি কোন বালক-বালিকার চোখ নিমেষের জন্যেও বন্ধ হয়ে যেত, তা হলে তাকে বালসেনার দলভুক্ত করা হত না। নেতাজী সুভাষ এই পরীক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন জেনারেল বিশেষতঃ General Ott (যিনি জাপানে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ছিলেন) আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন—"জার্মানীর বালক-বালিকারা খুবই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী কিন্তু এই বুলেট কানের ৬ ইঞ্চি পাশ দিয়ে গেলে তারাও চোখের পলক ঠিক রাখতে পারবে না।"

তাঁর সেই কথার উত্তরে নেতাজী সুভাষ বলেছিলে, "General Ott, আপনি এই বালসেনাদের role বুঝতে পারেন নি ; এরাই হবে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নায়ক। এক বিরাট সাধনায় তাদের দেহ-মনকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সংযত করতে হবে, এক নিমগ্ন ভারতীয় জাতিকে ভারতের পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি একটা সামান্য বুলেট shot শুনে ভয়ে তাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তারা ভবিষ্যতের কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন কি করে হবে ?"

নেতাজী সুভাষের ব্যক্তিত্ব যে ছিল হিমালয় সদৃশ তার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা এক বৃদ্ধ শিক্ষক বলছিলেন তাঁর ক্লাসে বসা ছাত্রদের কাছে। ঘটনাটা ঘটেছিল কবি-সঙ্গীতশিল্পী শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের সম্বর্দ্ধনা সভায়, স্থান ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, অনুষ্ঠানের সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সভার উদ্যোক্তা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। সভায় প্রচণ্ড হৈ-চৈ হচ্ছিল। দর্শকদের মধ্য হতে দাবি উঠছিল, সঙ্গীতশিল্পীকে আগেই গান গাইতে হবে। কবিগুরু নিজে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে উঠে দর্শকদের শান্ত হবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। গুরুদেবের প্রতি দর্শকদের অবাধ্যতা

লক্ষ্য করে সুভাষচন্দ্র লজ্জায় অপমানে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। টেবিলের উপর একটা এমন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলেন যে মনে হল টেবিলটা বুঝি ভেঙ্গে পড়ল। ক্ষণপরেই বলে উঠলেন—আপনারা কোথায় নেমেছেন ভেবে দেখুন, জাতির গুরুদেবের আদেশ ও অনুরোধকে আপনারা উপেক্ষা করেন, এত বড় সাহস আপনাদের। এই মুহূর্তে চুপ না করলে আমরা এ-সভা বন্ধ করে দেব। সুভাষের বজ্রকণ্ঠে এই ঘোষণা হবার পরই সভাস্থল যেন ম্যাজিকের মত নিশ্চুপ হয়ে গেল। কারও মুখে কথা নেই, শব্দ নেই। সুভাষচন্দ্রের সেই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা সে দৃশ্য কোনদিন ভুলতে পারবে না।

সেই সুভাষ, বাংলার ঘরের ছেলে সুভাষ, ভারতের বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তেজী পুরুষ সিংহ সুভাষচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসছেন। বৃটিশের সমর সাধ নির্মূল করে বিজয় মাল্যে বিভূষিত সুভাষ আসছেন। সুভাষচন্দ্র আসছেন তাই আজ কোটি কোটি মানুষের মনে আশার আশ্বাসের আলো ঝলমল করে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সুশিক্ষিত সায়ুধ সেনাবাহিনীকে এ দেশের সন্তানরা সম্মুখ সমরে পরাজিত করে বিজয় গৌরবে এগিয়ে আসছে। দেশের মানুষ তাই আজ আনন্দ-উদ্বেল।

যে সব মানুষের ঘরে বেতার গ্রাহক যন্ত্র আছে—তারা সর্বক্ষণ পরবর্তী কোন ঘোষণা শোনবার আশায় সুইচ অন করে রেখেছে। মাইক যন্ত্রের দোকানগুলোর সামনে, পান, বিড়ির দোকানের রেডিও যন্ত্রের সামনে কৌতূহলী মানুষের ঠাসা ভীড় লেগেই আছে। চলছে একটানা রণসঙ্গীত মাঝে মাঝে নেতাজীর বিভিন্ন বক্তৃতার রেকর্ড। শোনা গেল নেতাজীর কণ্ঠ—

"আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ। অদ্য আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিবস। কারণ ভারতের মুক্তি ফৌজ গঠিত হয়েছে এ কথা সমগ্র জগতের কাছে সর্বপ্রথম ঘোষণা করবার

সৌভাগ্য-মাল্য বিধাতা এতদিনে প্রসন্ন হয়ে আমার কণ্ঠে আজ অর্পণ করেছেন।

যে সিঙ্গাপুর সমরাঙ্গন ছিল প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির প্রধান শিবির, সেইখানেই ভারতীয় বাহিনী আজ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। এ বাহিনীই ভারত জননীকে বৃটিশের কবল হতে মুক্ত করবে। এ বাহিনী ভারতীয় নেতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনেই সংগঠিত হয়েছে—এ কথা মনে উদিত হলে ভারতবাসী মাত্রেই নিশ্চয় গর্ববোধ করবেন।

ভারতমুক্তির জন্য যেদিন ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হবে, সেদিন ভারতীয় নেতৃত্বের অধীনেই এগিয়ে যাবে সংগ্রাম ক্ষেত্রের দিকে এ বাহিনী।

আজ সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সমাধির উপর দাঁড়িয়ে সামান্য শিশু পর্যন্ত উপলব্ধি করবে যে, পরাক্রমশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতীতের বিষয়বস্তুতেই পরিণত হয়েছে।

হে আমার কমরেডগণ, হে আমার সৈনিকগণ 'দিল্লী চলো দিল্লী চলো' যুদ্ধের এ ডাক তোমাদের কণ্ঠে আজ সম্মিলিতভাবে উচ্চারিত হোক। আমি জানিনে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণামে আমাদের মধ্যে কয়জনের অস্তিত্ব অটুট হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি ভালোমত জানি যে পরিণামে আমাদের মধ্যে জয় অবশ্যম্ভাবী এবং ততদিন পর্যন্ত আমাদের সামরিক কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে না, যতদিন না আমাদের মধ্যে জীবিত বীর যোদ্ধাগণের বিজয়োল্লাসমুখর পদধ্বনি আর একটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমাধির উপরে শ্রুতিগোচর হয়, প্রাচীন দিল্লীর সেই লালকেল্লাই হবে সেই সমাধির পটভূমিকা।

আমার জনসেবার জীবন অধ্যায়ে বরাবরই আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করে এসেছি যে যদিও ভারতমাতা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করবার শক্তিতে সর্বতোভাবে যোগ্য হয়ে উঠেছেন, তথাপি তাঁর একটা বিশেষ অভাব ছিল—তা হচ্ছে ভারতীয় মুক্তি বাহিনী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন বিজয় পতাকা

উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পশ্চাতে ছিল এক প্রবল সামরিক বাহিনী। গ্যারিবল্ডীও ইতালীর গগনে স্বাধীনতা সূর্যের উত্থান ঘটিয়েছিলেন তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাধ্যমেই।

আজ তোমাদেরও পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা যে তোমরাই এগিয়ে এসে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রথম সংস্থা গঠন করে তুললে। যে সকল সৈনিকগণ তাদের জাতির প্রতি চিরকাল বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে, সকল অবস্থাতেই কর্তব্য যথারীতি পালন করে চলবে ও সর্বদাই আত্মবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবে, তারা অপরাজেয় বাহিনীর গৌরব লাভের অধিকারী হবেই। তাই তোমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এ তিনটি আদর্শই খোদিত করে রাখবে।

কমরেডগণ, তোমরা আজ ভারতের জাতীয় গৌরবের স্তম্ভ বিশেষ। ভারতমাতার আশা আকাঙ্খার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এমনভাবে পরিচালিত করবে যাতে তোমাদের দেশবাসিগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে অন্তর ভরে আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করতে পারে ও তোমাদের পরবর্তী বংশধরগণ তোমাদের গর্বে গর্বিত হয়ে উঠতে পারে।

তোমাদের নৈশান্ধকারজনক পরিস্থিতি ও উজ্জ্বল দিবালোকিত পরিবেশে তোমাদের সুখ-দুঃখে, তোমাদের নির্যাতন-নিপীড়নে, তোমাদের বিপর্যয় ও জয়ের সন্ধিক্ষণে আমি তোমাদের পার্শ্বেই সর্বদা থাকব—এ প্রতিশ্রুতির কথা আজ তোমাদের কাছে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি। তোমাদের এ-ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে বর্তমানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, সামরিক অভিযানের প্রেরণা ও মৃত্যু—এ কয়টি উপহার ছাড়া আমার আর কিছুই দেবার মত নাই। ভারতভূমিকে স্বাধীন অবস্থায় দেখবার জন্যে আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে না থাকবে—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আজ দরকার নাই। আমাদের পক্ষে আজ এ চিন্তাই যথেষ্ট—ভারতমাতা স্বাধীন হবেন এবং তাঁর শৃঙ্খল মোচন করতে আমরা সব কিছুই

উৎসর্গ করব।

আমাদের এ জাতীয় বাহিনীর প্রতি পরমেশ্বর আজ প্রসন্ন হউন। আসন্ন যুদ্ধাভিযানে তোমাদের উপর জয়ের কুসুম-মালা বিধাতা বর্ষণ করুন।”

নেতাজীর উপরোক্ত ভাষণ শেষ হতেই রেডিওতে হঠাৎ শোনা গেল বিশেষ ঘোষণা—

: আজাদ হিন্দ রেডিও, দিল্লী, একটি বিশেষ ঘোষণা—

—আজাদ হিন্দ সরকারের জনসংযোগ বিভাগ আনন্দের সঙ্গে জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছে যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নোক্ত কর্মসূচী অনুসারে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হবেন—

কলকাতা	...	১৫ই	জানুয়ারী
পাটনা	...	১৭ই	,,
কটক	...	১৮ই	,,
এলাহাবাদ	...	১৯শে	,,
বোম্বাই	...	২১শে	,,
হায়দ্রাবাদ	...	২৩শে	,,
মাদ্রাজ	...	২৫শে	,,
লাহোর	...	২৬শে	,,
অমৃতসর	...	২৮শে	,,

এবং দিল্লীর লাল কেল্লায় ও বড়লাট ভবনে আজাদ হিন্দ পতাকা উড্ডীনের অনুষ্ঠান হবে ৩০শে জানুয়ারী।

আজাদ হিন্দ রেডিও, দিল্লী—বিশেষ ঘোষণা সমাপ্ত। এই ঘোষণা আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রগুলি হতে পুনঃ পুনঃ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জয়হিন্দ্।

নেতাজী সুভাষ স্বয়ং জনমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা করবেন এই ঘোষণা জানামাত্র আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে যেন শুরু হয়ে গেল

সাজ সাজ রব!

১৫ই জানুয়ারী যতই এগিয়ে আসতে লাগল, বাংলার হাজার হাজার গ্রাম, জেলা শহর ও মহকুমা শহরের উদ্বেলিত মানুষ যেন কলকাতামুখী হয়ে চলল। কেউ পায়ে হেঁটে কেউ ট্রেনে চেপে কেউ গরুর গাড়ী সওয়ার হয়ে কেউ-বা সাইকেলে এগিয়ে চলল কলকাতার দিকে। সবার সাধ নেতাজী দর্শন।

চলো কলকাতা। নেতাজী নামে, সুভাষচন্দ্রের নামে কি যেন এক যাদু আছে, সেই যাদুর প্রভাবে দু'শত বৎসরের পরাভূত একটি জাতি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। সমগ্র জাতি হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে তারা ফিরে পেয়েছে পূর্ণ প্রাণময়তা। তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে বল, বীর্য, আত্মনির্ভরতা, এক নতুন অর্থ বহন করে। মনে মনে জনে জনে রটে যাচ্ছে সেই ডাক, সেই আহ্বান—শহর থেকে শহরে, গঞ্জ থেকে গঞ্জে, পল্লী থেকে পল্লীর আকাশে বাতাসে ইথারে ইথারে যেন সেই বিশেষ বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। হাটে মাঠে বাটে সর্বত্র মানুষের মুখে এক কথা—নেতাজী আসছেন। নেতাজী আসছেন বিজয়ী বীরের মত তাঁর আপনজনের মাঝে। নেতাজী আসছেন জনমানসের স্বপ্নের রাজপুত্রের মত স্বাধীনতা অর্জনের সফল পাকা পথে তাঁর তেজী শ্বেতবর্ণের "এ্যারাবিয়ান হর্স"-এ সওয়ার হয়ে। তাই মানুষের মনে এক আকাঙ্খা তাঁকে দেখে আসি, দেখে নয়ন-মন সার্থক করে আসি।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং ফোর্ট উইলিয়মের দায়িত্বে নিযুক্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্নেল বেনেগল-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ময়দানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপবেশনের সেরূপ ব্যবস্থা এ মহানগরীর অধিবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সারা ময়দান জুড়ে বিস্তার করে দেওয়া হয়েছে মাইকের জাল, ইলেকট্রিকের বাল্বের মালা। সামিয়ানা আচ্ছাদিত পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত মঞ্চের কাছাকাছি কয়েকটি বিশেষ স্থান ঘিরে রাখা হয়েছে মহিলা শিশু বৃদ্ধ ও অশক্তদের জন্য পর্যন্ত। ইউনিফর্মপরিহিত আজাদ হিন্দ সেনানীরা

এবং শ্বেত পোষাক ভূষিত কলকাতা পুলিশ সকাল থেকে ময়দান ঘিরে রেখেছে, যাতে কোনরকম বিশৃংখলা সৃষ্টি না হতে পারে। ভোর হতেই বিশেষ করে শহরের বাইরের মানুষদের মিছিল আসতে শুরু হয়ে গেছে। চোখে মুখে তাদের কি এক সীমাহীন কৌতূহল। তাদের অনেকেই 'জয় হিন্দ' বলে আই. এন. এ. সেনানীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সারা দিন ধরে অবিচ্ছিন্ন গতিতে মানব সমাগম হওয়ায় পড়ন্ত বিকালে যেন সারাটা ময়দান জনসমুদ্রের রূপ পরিগ্রহ করল। বিকেল হতেই নেতাজী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ, শের-এ-বঙ্গাল ফজলুল হক, হাসান শহীদ সারওয়ার্দি, মিঃ সত্যরঞ্জন বক্সী প্রভৃতি মঞ্চোপরি এসে উপবেশন করলেন।

দিবাশেষের সূর্য তখন ফোর্ট উইলিয়াম সন্নিহিত গঙ্গার ওপারে অস্তমুখী। পশ্চিমের আকাশে জমা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মাথায় ঠিকরে পড়া সূর্য কিরণে যেন বিচিত্র আলপনা।

ময়দানে সমবেত জনসমুদ্র মাঝে মাঝেই নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠছে। সেই শান্ত সায়ংকালে হঠাৎ ময়দানের মাইকগুলোতে শ্রুত হল ধাবমান অশ্বখুরের স্পষ্ট আওয়াজ। সে আওয়াজ শুনে জনতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। চরম কৌতূহলের অঞ্জমমাখা চোখে তাকায় এদিক ওদিক। অবশেষে তাদের কৌতূহলের উত্তর হয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসে একটি হৃষ্ট পুষ্ট ছুটন্ত তেজী ঘোড়া। ঘোড়াটির পিঠে সওয়ার হয়ে লাগাম বাগিয়ে যিনি বসে আছেন তিনি সর্বাধিনায়ক বেশে সজ্জিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে থেকে শুরু করে সভাস্থলের নিকট পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থায় পাটাতন পাতা পথে ধাবমান সেই তেজী অশ্বে নেতাজী এসে উপস্থিত হন সভামঞ্চের নিকট। ঘোড়ার পিঠে ঝুলন্ত কোষবদ্ধ তরবারি এক নিমেষে উন্মুক্ত করেন। তারপর সুপরিচিত ভঙ্গিতে সম্মুখ পানে তরবারি নির্দেশ করে বলে ওঠেন—চলো দিল্লী, দিল্লীর পথ—স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!

১৭ই জানুয়ারী হতে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত পাটনায়, কটকে, এলাহাবাদে, বোম্বাইয়ে, হায়দ্রাবাদে, মাদ্রাজে, লাহোরে, অমৃতসরে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্দিষ্ট ময়দানে সমবেত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে অশ্বারূঢ় নেতাজীর স্বকণ্ঠ নিঃসৃত আহ্বান শুনল—"দিল্লী চলো! দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ, চলো দিল্লী!"

অবশেষে এগিয়ে এলো ৩০শে জানুয়ারী—ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় এবং বৃটিশের দম্ভ ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডীয়মান বড়লাট ভবনে আজাদ হিন্দ পতাকা উত্তোলনের শুভ মুহূর্ত! ব্রহ্মপুত্র হতে কৃষ্ণা, কাবেরী, গঙ্গা বিধৌত বিভিন্ন ভাষাভাষী বিচিত্র পোষাক পরিহিত আসমুদ্র হিমাচলের স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষ আপনাপন আগ্রহে এসে সমবেত হলো লাল কেল্লার দুর্গ প্রাকার সন্নিহিত বিস্তীর্ণ ময়দানে। সুন্দর, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় সেদিন আই. এন. এ-র অফিসারমণ্ডলী এবং পুলিশ বাহিনী প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছে গলদঘর্ম হয়েও। তাঁদের সবার দৃষ্টি এই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেন কোনরূপ ত্রুটি না ঘটে, না ঘটে স্বাধীন সরকারের কর্মচারি বাহিনীর তরফে কোন বিচ্যুতি। সন্নিহিত ময়দানকে সুন্দর ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক রাজ্যের নামাঙ্কিত বৃহৎ ফলক লাগিয়ে। প্রতি রাজ্যের নির্দিষ্ট অংশে সুউচ্চ বেদি নির্মাণ করে তৎতৎ স্থানের নেতৃবৃন্দের সুষ্ঠু উপবেশনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেই সেই রাজ্য হতে আগত জনমণ্ডলীর উপবেশনেরও।

নির্দিষ্ট দিনের আগে থেকেই দূর দূর রাজ্যের মানুষরা এসে দিল্লীকে যেন উৎসবনগরীতে পরিণত করেছে। উৎসাহে, আগ্রহে, উন্মাদনায় উদ্বেল মানুষদের চোখেমুখে যেন কী এক অভূতপূর্ব আলোর দ্যুতি। সকলেই নেতাজীর সামনে এসে তাঁকে দর্শন করে যেন নয়ন-মন সার্থক করে স্বাধীনতার নব সঙ্কল্প গ্রহণের স্বপ্নে বিভোর। যেন নতুন দিন শুরুর রোশনাই।

এগিয়ে এলো যথা নির্দিষ্ট শুভ সেই মুহূর্ত। বিভিন্ন রাজ্যের

চিহ্নিত মঞ্চে বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। একটি কেন্দ্রীয় মঞ্চে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে উপবিষ্ট দেখা গেল। তাঁদের কারো কারো চোখেমুখে উৎসাহের অঞ্জন, কারো কারো চোখেমুখে বা আবার উদ্বেগের ও অনিশ্চয়তার ঘন কালো মেঘ।

উৎসাহী জনতা থেকে থেকে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে ধ্বনি দিয়ে উঠছে—নেতাজী সুভাষ কি জয়! আজাদ হিন্দ্ সরকার —জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

শুভ সময়ের সমুপস্থিতিতে মাইকে ঘোষিত হল নেতাজী সুভাষের আগমনপূর্ব বার্তা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লক্ষ বিচিত্র পোষাকে আচ্ছাদিত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতা যেন হল মন্ত্রমুগ্ধ। সভাস্থল ডুবে গেল সীমাহীন নিঃস্তব্ধতায়।

ময়দান জুড়ে প্রলম্বিত মাইক্রোফোনগুলিতে সেই নৈঃশব্দ খান্-খান্ করে শ্রুত হল ছুটন্ত অশ্বখুরের শব্দ। বিস্ময়াবিষ্ট জনমণ্ডলী নিরীক্ষণ করল তেজী শ্বেত বর্ণের অশ্বারূঢ় নেতাজী সুভাষ দূর হতে বিশেষ পথ দিয়ে সভাস্থলের পুষ্পাচ্ছাদিত বিশেষ মঞ্চের দিকে অগ্রসরমান। সেই মঞ্চের সন্নিহিত লালকেল্লার দুর্গ-প্রাকারে উড়ছে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ ইউনিয়ন জ্যাক। নেতাজীকে দর্শনমাত্র জনতা আনন্দে আগ্রহে উদ্বেল হয়ে উঠল! লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল—নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ—লং লিভ নেতাজী সুভাষ। অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে শৌর্যবীর্যের প্রতিমূর্তি সৈনাধ্যক্ষের পোষাকমণ্ডিত নেতাজী জনতার উদ্দেশে হস্ত আন্দোলিত করলেন। তাঁর হস্ত সঞ্চালনের উত্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত করতালি ও জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করল।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেলেন পতাকা-দণ্ডের কাছে, নামিয়ে নিলেন ইউনিয়ন জ্যাক, ঘৃণাভরে তা দুমড়ে মুচড়ে নিক্ষেপ করলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল যেন গাম্ভীর্যে গভীর। এরপর জনৈক আজাদ হিন্দ্ অফিসার তাঁর হাতে তুলে দিল ব্যাঘ্র লাঞ্ছিত আজাদ-হিন্দ্ পতাকা। পতাকা-দণ্ডে উড্ডীন হল সেই বহু আকাঙ্খিত আটত্রিশ

কোটি অধিবাসী বাঞ্ছিত পতাকা। জনমণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করতালি দিয়ে উঠল।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের মাউথপীসের কাছে। শুরু করলেন সময়োচিত অভিভাষণ।

—আমার চিরপ্রিয় দেশবাসীগণ! আমার সেই রহস্যপূর্ণ অন্তর্ধানের পর অনেকগুলি অধ্যায় শেষ করে যে আবার আপনাদের সামনে এসে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি—সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রতি; ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি। আপনাদের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা অদৃশ্য ভাবে ক্রিয়াশীল না থাকলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বাধীনতার মত মহান কাজ কিছুতেই সুসম্পূর্ণ করতে পারত না।

আজ আমি যতটা আনন্দিত ঠিক ততটাই বিমর্ষ আমার একদার সহকর্মী কোন কোন নেতার ইংরেজের সঙ্গে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রচারণার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে এবং আমার বাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করবার ঘটনায়।

ইংরেজ প্রচার করেছিল আমি নাকি জাপানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর কুকুর, আমি নাকি জাপানী সাম্রাজ্যবাদিদের ভারতের মাটিতে নিয়ে আসছি পথপ্রদর্শন করে। কিন্তু আজ আপনারা কি দেখছেন? দেখছেন কি ভারতের বুকে জাপানী সাম্রাজ্যের কোন স্বাক্ষর?

লক্ষ লক্ষ জনতা সমবেত কণ্ঠে গর্জন করে যেন বলে উঠল—

: না! না! না!

লাল কেল্লার দুর্গ প্রাকারে জনতার দৃঢ়তাব্যাঞ্জক একটি অক্ষরের কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সুভাষচন্দ্র পুনরায় বলতে থাকেন—

: আমি জানি যে সকল দেশবাসী নিজেদের বৃটিশের বা মিত্র-শক্তির এজেণ্ট রূপে কখনও মনে করেন না—তাঁদের কেউই আমাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় ভূষিত করেন নি বা করতে পারেন না। আজাদ

হিন্দ বাহিনী' এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপতি রূপে ওয়ারলর্ড আমি গত ১৯৪৪ সালে ৬ই জুলাই মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলাম তাতে স্পষ্ট বলেছিলাম যে আমরা যে এখানে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য হল অস্ত্রের সাহায্যে ভারতকে বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত করা। ভারত থেকে বৃটিশদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করবার পর এই সামরিক সরকারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সব কিছু দুঃখ, কষ্ট ও আত্মত্যাগের একমাত্র পুরস্কার চাই জন্মভূমির পূর্ণ স্বাধীনতা। আমি আরও বলেছিলাম মহাত্মাজী, আপনি আমাদের জাতির পিতা, তাই ভারতের এই পবিত্র মুক্তি সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

আমার সেদিনের সেই আবেদনে সাড়া দেননি মহাত্মাজী। তাই আমার মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে "সীতারামিয়াস ডিফিট ইজ মাই ডিফিট" উক্তির সময়কার মানসিকতায়ই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। আমি বৃটিশ ইন্টেলিজেন্স শাখার রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠ করেও দেখলাম যে ১৯৪২ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবও একটি প্রস্তাবমাত্রই ছিল। যে নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাঁরা তা কার্যকরী করবার কোন সনিষ্ঠ প্রয়াসই কখনও চালান নি। যদিও জনগণ চেয়েছিল যে সে আন্দোলন চলুক।

এমন অবস্থায় আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপোষপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার পক্ষে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোন অর্থই হয় না। তা করা হলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যেমন আমাকে অপমানিত করা হয়েছিল তেমনি অপমানিত করার চেষ্টা করা হবে গান্ধী নেহেরু গ্রুপ-এর দ্বারা।

আপনারা জানেন যে আমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নি। আজও তাই মিথ্যা বলার অপবাদ কাঁধে নিয়ে নিজেকে নীচতা ও হীনতার শিকার হতে দেব না। এখন আমাদের কাজ দেশকে

সুসমৃদ্ধ করা। এ কাজ আমার পক্ষে করা তখনই সম্ভব যদি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেশবাসী আমার হাতে সমর্পণ করেন। তাই আমাদের এই ঐতিহাসিক শুভ মুহূর্তে আমি দেশবাসীর কাছে জানতে চাই—আপনারা গান্ধীজী ও আমার নেতৃত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিন। আপনারা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলুন আপনারা কার নেতৃত্ব দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণকর বলে মনে করেন।

সমবেত লক্ষ লক্ষ লোক লাল কেল্লা সন্নিহিত ময়দান প্রকম্পিত করে যেন গর্জে ওঠে—

: নেতাজী সুভাষ কি জয়! লং লিভ সুভাষবাদ!

সুভাষচন্দ্র ইঙ্গিতে জনতাকে শান্ত হতে বলে আবার ভাষণ শুরু করেন—

: দেখতে পাচ্ছি আপামর জনগণ আমাকে চাইছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি রাজ্য ওয়াড়ি ভাবে নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তও জানতে চাই।

অতঃপর প্রত্যেক রাজ্যের নেতৃবৃন্দের অভিমত জানাতে হাত তুলতে যখন সুভাষচন্দ্র আবেদন রাখলেন তখন প্রায় সব রাজ্যের নেতারাই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব প্রার্থিত বলে জানালেন। নেতাদের অভিমত জানবার পর সুভাষচন্দ্র বলতে থাকেন—

: আমার নেতৃত্ব মানেই হল শুভের বোধন এবং অশুভের বিদায়। স্বাধীন ভারতকে গড়ে তোলার যারা কারিগর হবেন তাঁদের একমাত্র আদর্শ হবে 'স্যাক্রিফাইস'। অর্থাৎ দিয়ে যেতে হবে, শুধুই দিয়ে যেতে হবে, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে হবে। তাই এখানে গোষ্ঠীতন্ত্রের কোন স্থান নেই। গোষ্ঠীতন্ত্র থেকেই গড়ে ওঠে সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই সুবিধাভোগী শ্রেণী ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা করায়ত্ত রাখবার জন্য অনুগ্রহভাজন একটা তুষ্টচক্র গড়ে তোলে। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই যাঁরা নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে চান তাঁদের প্রত্যেককেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। আমি

দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে আপনাদের ক্লান্তি উৎপাদন করতে চাই না। কারণ কথার দ্বারা দেশ গঠন হয় না—দেশ গঠনে চাই কাজ! আজকের মত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে সকলে এককণ্ঠে বলুন—স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ!

জনতা গর্জে উঠে বলে—

—স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ!

সুভাষচন্দ্র বলেন—

: বলুন 'জয় হিন্দ'!

: জয় হিন্দ!

জনতা সমস্বরে গর্জে ওঠে।

অতঃপর যুক্তকরে বিদায় নেন সুভাষচন্দ্র। অদূরে অপেক্ষারত শ্বেতবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে তিনি লাগাম বাগিয়ে ধরতেই অশ্বটি গ্যালপে ছুটে বেরিয়ে যায় ময়দান ছেড়ে। মাইক্রোফোন যন্ত্রে অশ্বক্ষুরের চলমান শব্দ মিলিয়ে গেলে জনতা ছত্রভঙ্গ হতে সুরু করে।

বড়লাট ভবন বা ভাইসরয়েস প্যালেস সন্নিহিত এলাকায়ও জমা হয়েছে বিরাট জনতা। লাট ভবনের শীর্ষদেশে তখনও উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। দ্রুত ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে নেতাজী সুভাষ এসে নামেন লাট ভবনের চত্বরে। আই. এন. এ. দেহরক্ষীদল তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ধাবমান। সুভাষচন্দ্র এগিয়ে যান যথাস্থানে। অপসারিত করেন ইউনিয়ন জ্যাক, উত্তোলন করেন মহিমান্বিত আজাদ হিন্দ্ পতাকা।

এখানে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে শৃঙ্খলিত বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এবং শৃঙ্খলিত প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেককে আনা হয়। তাঁদের সম্মিলিত ভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং সৈন্য হতাহত করার জন্য মার্জনা চাইতে হয় স্বহস্তে স্বাক্ষর দিয়ে।

এ অনুষ্ঠান চলাকালীন জনতা বারবার ধ্বনি দিয়ে ওঠে—

ঃ বৃটিশ সাম্রাজ্য—মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ।

ঃ নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ!

ঃ জয় হিন্দ।

লালকেল্লা ও বড়লাট ভবনের অনুষ্ঠানের সংবাদ যখন আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হয় তখন আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দ যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। পরাধীন মানুষগুলির বক্ষ যেন স্বাধীনতার নির্মল নিঃশ্বাসে হয়ে ওঠে স্ফীত। তারা উপলব্ধি করে যে দু'শ বছরের পরাধীনতার পাষাণভার যেন তাদের বুক থেকে নেমে গেল। সমগ্র দেশে নেতাজী সুভষচন্দ্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই দুটি অনুষ্ঠান অন্তে। প্রত্যেক ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে তারা এক সামরিক জাতি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কুক্ষিগত স্বাধীনতা আপন দেশবাসীর বীরত্ব ব্যঞ্জনায় ও শৌর্যবীর্যের দ্বারা অবশেষে সত্যই ছিনিয়ে আনতে পেরেছে।

বড়লাট ভবনের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের পরই দরবার হলে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। দেশের উচ্চ আদালত-গুলির সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান বিচারককে নিযুক্ত করা হয় কেন্দ্রীয় বিচারালয়ের ন্যায়াধিপতি রূপে। তাঁর দ্বারা দেশের রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র। শপথ বাক্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেন—

"ভারতের আটত্রিশ কোটি নরনারীর কল্যাণবিধানকামী কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু পরমেশ্বরের নামে অঙ্গীকার করিতেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভারত ও ভারতীয় জনগণের মঙ্গল বিধানের জন্য ন্যায়বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে যত্নবান থাকিব।"

এ অনুষ্ঠানে সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলে আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাধীন ভারতের

রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সুভাষচন্দ্র মিলিত হন দিল্লীতে বিশেষ আমন্ত্রণে আগত বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে।

প্রথমে তাঁর সঙ্গে দরবার হলে আলোচনা আসরে আহুত হলেন বাংলার নেতৃবৃন্দ। বাংলার নেতাবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রী শরৎ বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার বসু, ফজলুল হক, হাসান শহীদ সারওয়ার্দি, নুরুল আমিন, সত্যরঞ্জন বক্সী উপস্থিত ছিলেন।

যথাবিহিত সম্ভাষণ বিনিময়ের পর সুভাষচন্দ্র বলেন—

ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবী যুবকদের রক্তদান শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে পেরেছে ; প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম হতে মাস্টার দা, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের বুকের রক্তে অর্জিত হয়েছে এই মহান স্বাধীনতা। তাই এ স্বাধীনতাকে যদি জাতি-কল্যাণে সার্থক ও সফল করে না তুলতে পারি আমরা তবে আগামী দিনে জাতি আমাদের ক্ষমা করবে না।

শরৎ বসু বলেন—

ঃ প্রশাসনিক ষ্ট্রাকচার-এ ইংরেজের ব্যুরোক্র্যাটদের যে ভূমিকা রয়েছে, অর্থাৎ আই.সি.এস, আই. পি. এস.-দের যে প্রাধান্য রয়েছে, তাই কি যথাপুর্ব বজায় থাকবে ?

সুভাষচন্দ্র বলেন—

ঃ ইংরেজের ব্যুরোক্র্যাটরা এখন দৃশ্যতঃ প্রশাসন চালালেও তাদের ডিক্টেট করছে প্রায় ক্ষেত্রেই আজাদ হিন্দ সেক্রেটারিয়েটের অতি বিশ্বস্ত অফিসাররা। আমরা অতি কৌশলে তাদের প্রায় সবার সার্ভিস রেকর্ড হস্তগত করেছি। তা খতিয়ে দেখে ঝাড়াই-বাছাই শেষ করব। প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আই. সি. এস.-দের ক্ষমতার ওপরে থাকবে গড়ে তোলা ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া স্যাক্রিফাইসিং সারভিস-এর সদস্যদের স্থান। এ কথা মনে রাখতে হবে যে স্ব-স্বার্থের জন্য যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়েছে বৃটিশের হুকুম কায়েম করতে, যারা নিজেদের

ইংরেজের পোষ্যপুত্র ভাবতে শ্লাঘা বোধ করে তাদের হাতে স্বাধীন ভারতের জনগণ-স্বার্থ নিরাপদ নয়। তা ছাড়া আমাদের প্রশাসনের মূল নীতিই হবে স্বার্থত্যাগ—স্যাক্রিফাইস। আই. আই. এস. এস.-এর সদস্যদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হবে দেশের স্বার্থ দশের স্বার্থ, সুরক্ষিত করা। তাই তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে থাকা চলবে না, বিশেষ এক ধরণের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আজীবন ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে।

সত্যরঞ্জন বক্সী বলেন—

ঃ স্বাধীন ভারতের মূল কাঠামো কিরূপ হবে বলে ভাবছেন ?

সুভাষচন্দ্র বলেন—

ঃ সি. আর. দাশের সভাপতিত্বে ১৯২৪ সালের ১৭ই আগষ্ট স্বরাজ্য পার্টির প্রকাশ্য অধিবেশনে মুক্তিযোদ্ধা মৌলানা হজরৎ মোহানী যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাতে বলা হয় Independent India shall be a federation of Indian States. স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক রূপরেখা ঐভাবেই গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ধ্যানধারণার ডিক্টেটরশিপ সৎচরিত্রের মানুষদের প্রতি ক্ষেত্রে দেবতা সুলভ গুণাবলী অর্জনে দেবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আর অসৎ চরিত্রের মানুষদের জীবনে আনবে পরিপূর্ণ ত্রাস, বিভীষিকা। ইতিমধ্যেই দশ হাজার কালো বাজারী, সাত হাজার ভেজালকারী এবং তিন হাজার প্রশাসনিক বাটপাড়কে আটক করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ইংরেজের খেতাবধারী রায়বাহাদুর, রায় সাহেব, খান সাহেব, খান বাহাদুরদের। প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে দেশীয় ও করদ রাজ্যগুলিতে প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণে নব প্রশাসন।

ফজলুল হক জানতে চান—

ঃ তা হলে বলুন এবার আমাদের রাজ্যের জন্য আমাদের কি করতে হবে ?

সুভাষচন্দ্র বলেন—

: আমি চাই দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচী সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হোক। তাই খুব শীঘ্র বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের ছক আপনারা ফিরে গিয়ে তৈরী করে ফেলুন। সেই ছক নির্মাণে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক স্ট্যাটিসটিক্যাল এক্সপার্টস্ বিভিন্ন দলীয় জননেতাদের ও সমাজ-সেবীদের নিয়ে রাজ্যস্তরে স্টেট কাউন্সিল গড়ে তুলে একটা সার্বিক প্ল্যান তৈরী করে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। সেই প্ল্যান যেন স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা বহির্ভূত না হয়। প্রথম গুরুত্ব দেবেন মানুষকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবার, দ্বিতীয় গুরুত্ব দেবেন শিক্ষা ব্যবস্থায়, তৃতীয় গুরুত্ব দিতে হবে যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার দূরীকরণে। এইভাবে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জাতীয় প্রবণতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের জীবনদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মিশ্রন ঘটিয়ে নবভারত গঠনের নববাদ রচনা করতে হবে।

সামাজিক স্তর থেকে মানুষকে গড়ে তুলতে সর্ব অঞ্চলের শিক্ষক অধ্যাপকদের উপর একেবারে প্রাথমিক স্তরের সমাজ সংস্কারের ভার দিতে হবে। রাজনীতির নেতাদের অনাবশ্যক আত্মপ্রচারের কোন প্রয়াস থাকবে না। নিজেকে সুবুদ্ধিজীবী হিসেবে জনমনে স্থান করে নিতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই যেন জীবিকার প্রয়োজনে সমাজকে ঠকাবার প্রচেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

শ্রীহেমন্ত বসু বলেন—

: নেতাজী, আমরা ১৯০৫ সালের পার্টিশানের পূর্বেকার সীমানার বাংলাকেই কি বাংলা হিসেবে ধরব ?

সুভাষচন্দ্র বলেন—

: অবশ্যই। ইংরেজ সরকার বাংলার বিপ্লববাদ ও ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবণতার জন্য বাঙালীকে শাস্তি দেবার জন্যই বঙ্গভঙ্গের কুসিদ্ধান্ত নেয়—তাই তার সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া চলতে পারে না কিছুতেই।

হাসান শহীদ সারওয়ার্দি বলেন—

: আচ্ছা, ধর্ম বিষয়ে সরকারের নীতি কি হবে ?

—প্রত্যেক ধর্মের মানুষের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হবে সমান। যিনি যে ধর্মে আস্থাশীল তাঁর সেই ধর্ম অবলম্বন করে জীবন যাত্রা নির্বাহ করবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। কিন্তু ধর্মের গোড়ামী যদি রাষ্ট্র, দেশ ও জনতার জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে তবে তা অবশ্যই প্রতিহত করা হবে।

শীঘ্রই আমার সরকার বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে একটি করে সুপ্রিম কাউন্সিল গড়বে। সেই সব কাউন্সিলের নেতাদের নিয়ে সর্বধর্মের একটি সমন্বয় সংস্থা গঠিত হবে যা সর্বধর্মের মানুষদের প্রতি সরকারি আচরণ বিধি রচনা করবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে পরাধীন দেশের শাসন থেকে স্বাধীন দেশের সরকারের চরিত্র যে আলাদা, প্রথমটি যেমন শোষণ নির্ভর, দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল সেবা নির্ভর—এটা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই।

বাংলার প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের পর আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ করতে করতে ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত্রির পরিধি অতিক্রম করল। অতঃপর নেতাজী মিলিত হলেন প্রায় সকল প্রদেশের উল্লেখযোগ্য আমলাবৃন্দ এবং আই. পি. এস. অফিসারদের সঙ্গে। সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ শেষ করে সুভাষচন্দ্র বলতে থাকেন—

: বৃটিশের ষ্টিল ফ্রেম্‌ড এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আপনারা যে ইঙ্গ-ভারতীয় মানসিকতার শিকার হয়েছেন সে মানসিকতার বেড়াজাল থেকে যদি আপনারা বেরিয়ে আসতে না পারেন তবে স্বাধীনতা-উত্তর নতুন দেশ গড়ার কারিগর হতে ব্যর্থ হবেন। আপনাদের অনেকেই নানা ইউনিভার্সিটির ব্লু বয়, আপনাদের অনেকরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিয়ে দেশবাসীর উপর

অত্যাচার অবিচারের ষ্টিম রোলার চালিয়েছে চতুর ইংরেজ সরকার। মনে রাখবেন অসীম শক্তিধর বৃটিশ লায়নের লাঙ্গুল আমি মুড়ে তাড়িয়েছি। তাই দেশবাসীর প্রতি জনকল্যাণ বা ওয়েলফেয়ার এ্যাটিচুড নিয়ে যদি সত্যিকারের প্রশাসনিক ষ্ট্রাকচার'আপনারা গড়ে তুলতে না পারেন তবে আপনাদের আবর্জনা ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমার মনে তিল মাত্র মমতা জাগবে না। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী মনেপ্রাণে আমি মেনে চলব—যে বাণীতে স্বামীজী বলেছেন—

> "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষালাভ করে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রের কথা একটিবার চিন্তা করবার অবসর পায় না—তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক অজ্ঞানে ডুবে থাকবে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না—এমন প্রত্যেকটি লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি।"

আমার প্রশাসনের মূল কথা হবে মানুষের প্রতি মমতা।

আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ইংরেজের প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের সম্পদ শোষণ করে গ্রেট ব্রিটেনে তা পাচার করা। কিন্তু এখন যে প্রশাসন চলবে তার মূল উদ্দেশ্য হবে দেশের সম্পদ দেশের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলে যথাযথ ভাবে বিনিয়োগ করা। দুঃখ, দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্ত দেশবাসী আপামর জন-সাধারণের মনে সৃষ্টি করতে হবে নতুন আশা আকাঙ্খা। প্রশাসনে একটি কল্যাণকর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে আর প্রশাসক ও সরকারী সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে পরিজন সুলভ আত্মিক যোগ স্থাপন করতে হবে। আমার শাসনে দুর্বলতম ব্যক্তিরও যেন মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে প্রবলতর কোন শক্তি তার উপর অত্যাচার করতে এলে সরকারী ব্যবস্থায় তা হবে অবশ্যই প্রতিহত।

প্রথমত পুলিশ প্রশাসনকে দুষ্ট চরিত্রের লোক—যেমন দাগী চোর, ডাকাত, ঠগ, সমাজবিরোধী চক্রকে গ্রেফতার করতে হবে। পথ ঘাটের ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ, বড় বড় শহরের পথ অপরিচ্ছন্ন করে বসবাসকারীদের নির্দিষ্ট সংশোধন ও সেবা কেন্দ্র সমূহে নিয়ে যেতে হবে। নারী শিশু পুরুষদের আলাদা ক্যাম্প করতে হবে। সুন্দর সুস্থ জীবনে এদের নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে হবে।

জমিদার, জোতদার, কুশীদজীবীদের তালিকা তৈরী করে সব অঞ্চলের ভূমি সংস্কার করে জমিগুলিকে এক লপ্তে এনে এক এক এলাকার জমির মালিকদের এক একটি সমবায় সমিতিভুক্ত করতেই হবে। কৃষি শ্রমিকদের সেই সব সমবায়ে বিভিন্ন কাজে লাগাতে হবে। সারপ্লাস কৃষি শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন এলাকায় কাঁচামালের সম্ভাবনা ও যোগান ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তবে বড় বড় শিল্প কারখানার চেয়ে মাঝারি শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পই প্রয়োজন। কেননা আমাদের এ দেশ man power-এর দেশ। দু'শ বছরের পরাধীনতায় কোনরকম কর্মোদ্যোগের সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে অধিকাংশ মানুষ অলস ও ভাগ্যবাদী হয়ে পড়েছে। নিজেদের সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছে নানারকম 'সুপারষ্টিশন' বা কুসংস্কারের মধ্যে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। এই মনুষ্যহীনতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দরিদ্র, অবহেলিত চতুর চূড়ামণি জমিদার, জোতদার, সুদখোরদের শিকার মূক, মূর্খ মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে হবে এবং আগামী-দিনের সম্ভাবনার আলোকে এদের অন্ধকারময় জীবনে রচনা করতে হবে উৎসাহের আলোক পথ। দেশ কিছুতেই এগুবে না এদের উদ্যোগ ছাড়া। কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—

তুমি যারে নীচে ফেল, সে তোমারে টানিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

আমলাকুলের ও পুলিশ প্রশাসনের সুপার বস্‌দের সঙ্গে বৈঠকের পর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু হল রাষ্ট্র নিয়ন্তা সুভাষচন্দ্রের দেশের বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। প্রথমেই আজাদ হিন্দ্

সেক্রেটারিয়েটের প্রথম শ্রেণীর অফিসার চতুষ্টয় কক্ষে নিয়ে এলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে। সুভাষচন্দ্র আসন থেকে গাত্রোত্থান করে সসম্ভ্রমে স্বাগত জানালেন গান্ধীজীকে—

: আসুন মহাত্মাজী, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। তাঁর ইঙ্গিতে অফিসারবৃন্দ চলে গেলে গান্ধীজী উপবেশন করবার পর সুভাষচন্দ্র নিজ আসন দখল করলেন। বললেন—

: দীর্ঘদিন পর যে আপনার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাব তা ইউরোপ থেকে এশিয়ায় সাবমেরিন যোগে দুর্গম যাত্রাপথের সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকাপাত পর্যন্ত সময়ে ভাবতে পারিনি। বলুন মহাত্মাজী, আপনার শারীরিক কুশলাদি।

: সুভাষচন্দ্র, আমার কুশলাদি জেনে লাভ নেই। একজন পরাজিত রাজনীতিকের কুশল নিয়ে বিজয়ী বীরের কি এমন প্রয়োজন বল তো?

: মহাত্মাজী, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান জানানোই ভারতের সামাজিক শিষ্টাচার।

: রাজনীতি ক্ষেত্রে এসেও তুমি যে তোমার মন ও বিবেককে এমন উন্নত রাখতে পেরেছ তা সত্যই বিস্ময়কর। আজ অকপটে স্বীকার করছি সুভাষ—আমি পরাজিত। তোমার গুরু সি. আর. দাশের মৃত্যুর পর যখন মতিলাল নেহেরুর হাতে গেল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, তখন রাজ্যগুলির নেতারা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করল না। ফলে প্রায় অরাজক অবস্থা। এমনি সময় মতিলালজির সঙ্গে আমার যে চুক্তি হল তাকে বলা হয় 'আমেদাবাদ-এলাহাবাদ প্যাক্ট'। সেই প্যাক্ট মোতাবেক আমি মতিলালজির কাছে কংগ্রেসে আমার নেতৃত্বে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা এবং উত্তরাধিকার রূপে জহরকে মনোনয়নে হই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমি সত্য রক্ষায় তোমার প্রতি অনেক সময়ই অন্যায় আচরণ করেছি। আজ বুঝতে পারছি পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সেদিনই ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। তা ছাড়া তুমি আই.সি.এস. পদ প্রত্যাখ্যান

করে লণ্ডন থেকে বোম্বাইয়ে নেমে যেদিন আমার সঙ্গে ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে দুরদর্শীর মত প্রশ্ন করতে থাকলে সেদিন তার যথাযথ উত্তর দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে কলকাতায় গিয়ে দাশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম তোমার মধ্যে কি সে আগুন লুক্কায়িত আছে।

গান্ধীজী কথা শেষ করলে সুভাষচন্দ্র বলেন—

ঃ মহাত্মাজী, স্বাধীন ভারতের রূপরেখা বা প্ল্যানিং চকআউট-এ আপনার পরামর্শ চাই।

ঃ সুভাষ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে বা জাতি গঠনে দ্বৈত নেতৃত্ব অচল। এ শিক্ষা তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তাই তোমার নিজের ধ্যান-ধারনামত ভারতকে গড়ে তোল—এই আমি প্রার্থনা করি পরমেশ্বরের কাছে। এই আমার আন্তরিক কামনা। যদি অনুমতি কর, আমি বিদায় চাইছি।

সুভাষচন্দ্র কলিংবেল-এর বোতাম টিপতে সেই চারজন অফিসার কক্ষে ঢুকলেন এবং গান্ধীজীকে সসম্ভ্রমে নিয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা মহম্মদ আলি জিন্না সহ পুনঃপ্রবেশ করলেন। সুভাষচন্দ্র মিঃ জিন্নার সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। অফিসাররা বাইরে চলে গেলে সুভাষচন্দ্র বলেন—

ঃ বলুন মিষ্টার জিন্না, আমি সাম্প্রদায়িকতাবাদি মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্নার সঙ্গে বাক্যালাপ করব, নাকি আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অন্যতম এব্‌ল্‌ লিডার মিঃ জিন্নার সঙ্গে কথা বলব?

মিঃ জিন্না মৃদু হেসে বলেন—

ঃ আমি যখন স্বাধীন ভারতের ফুয়েরার বা মুক্তিদাতার সঙ্গে কথা বলছি—তখন আমি ভারতের নেতা হিসাবেই কথা বলতে চাই। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে নিজেকে ভারতীয়দের নেতা বলে পরিচয় দিতেই বিশেষ পছন্দ করি আমি। কিন্তু মিঃ প্রেসিডেণ্ট, যখন দেখলাম যে গান্ধীজী নেহেরুর মত বুদ্ধিহীন বাচালকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইংরেজের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ রাখছেন

যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, তখন আমিও বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' পলিসির সঙ্গে সঙ্গতিসূচক "টু নেশন থিয়োরী" দিয়ে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুললাম। কংগ্রেস প্রকাশ্যে বলতে চায় স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে—আর তলে তলে ইংরেজকে আশ্বাস দিল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই খুশি—এই দ্বৈত ভূমিকারই জবাব আমার 'পাকিস্তান' প্রস্তাব। তা ছাড়া গান্ধীজী যদি খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করে ধর্মীয় চিন্তায় এ্যাগ্রেসিভ এ্যাণ্ড ফ্যানাটিক প্র্যাকটিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড মুসলমান সমাজকে প্রশ্রয় না দিতেন তবে আমি মুসলমানদের তুরুপের তাশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম না।

: থাক ও সব কথা, 'পাস্ট ইজ পাস্ট'। আসুন মিঃ জিন্না আমরা 'ফিউচার'-এর কথা চিন্তা করি। আপনি সামগ্রিক ভাবে ভারতের জনগণের স্বার্থে এবং মুসলিম জনগণের স্বার্থে দুটি স্কীম আমাকে দিন। স্বাধীন ভারতের রূপরেখা নির্ণয়ে আমি যেন সেই স্কীম থেকে পাই মূল্যবান পরামর্শ।

বললেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর কথা শেষ হতে মিঃ জিন্না বললেন—

: ওয়েল মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমি যত শীঘ্র পারি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

: ধন্যবাদ মিঃ জিন্না।

মিঃ জিন্না সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিদায়কালীন করমর্দন করে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর অফিসাররা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে নিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র আসনে বসেই স্মিত হেসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। জহরলাল হাস্যোদ্ভাসিত বদনে যুক্তকরসহ বললেন—

: নমস্তে।

সুভাষচন্দ্র প্রতি নমস্কার জানিয়ে তাঁকে বসতে বললেন। অফিসাররা কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হলে বললেন—

: তারপর জহরলাল, স্বাধীনতা কি তবে সত্যই এসে গেল?

তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে তরবারি দিয়ে বীরবিক্রমে আমার সঙ্গে ডুয়েল ফাইটের সুযোগ তোমায় ভগবান দিলেন না।

: আই এ্যাম সো সরি মিঃ প্রেসিডেণ্ট। তখন ইংরেজের ইণ্টেলিজেন্স বাহিনী আমায় এমন ভুল বুঝিয়েছিল যে······

: শুধু ইংরেজের ইণ্টেলিজেন্সই নয় জহরলাল, তোমার বন্ধু রাশ্যান কমরেডরাও তোমাকে ভাবী ভারতের কর্ণধার ভেবে নিজেদের পাঞ্জার পরিধিতে রাখতে কম উৎসাহিত করেনি।

: অতীতের আচরণের জন্য আমি দুঃখিত মিঃ প্রেসিডেণ্ট।

: দুঃখ প্রকাশে ইতিহাস তো মুছে যাবে না জহরলাল, আদর্শ সম্বন্ধে তুমি জীবনে কোনদিনই মনস্থির করে উঠতে পারনি। সোশ্যালিস্ট জয়প্রকাশের অনুপ্রেরণায় প্রথমে এলে কংগ্রেসে, যখন দেখলে দলে আমার খুব প্রভাব তরুণ সদস্যদের মধ্যে তখন তুমি আমার বড় ভক্ত, আবার যেইমাত্র দেখলে ব্যবসায়ীদের চাঁদায় গান্ধীজীর গ্রুপ বেশ পাকাপোক্ত, তখন তুমি বাপুজীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হতে তাঁর বশংবদ হয়ে পড়লে।

: মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমাকে এভাবে······

বলতে যাচ্ছিলেন জহরলাল, তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই সুভাষচন্দ্র বললেন—

: সত্যিই অন্যায় হচ্ছে আমার, তাই ভাবছ তুমি। কিন্তু recapitulating the then history—এতে এক বর্ণও অসত্য নেই জহরলাল। যাক, ইংরেজের হাত থেকে প্ল্যান মাফিক পাওয়ার যখন পেলে না—এখন দেশ সেবায় কি ভূমিকা নিতে চাও তা জানতে চাইছি তোমার কাছ থেকে—স্বাধীন ভারত সরকারের হতভাগ্য এই প্রেসিডেণ্ট!

: মানে, মানে আমি কি করতে পারি তা ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

: বুঝে ওঠবার ক্ষমতা by birth Indian by culture Mnslim and by education Britisher জহরলালের মত

ফিকল মাইণ্ডেড পলিটিশিয়ানের যে খুবই সীমাবদ্ধ তা আমার অজানা নেই। তাই সারা ভারতের কথা না ভেবে উত্তরপ্রদেশকে কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার স্কীম তোমার কাছ থেকে আমি চাইছি। কি রাজি?

: আপনার যেমন আদেশ, তাই হবে। আমি কি আসতে পারি এখন?

বললেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। সুভাষচন্দ্র কলিংবেল বাজাতে অফিসাররা দ্রুত ঘরে ঢুকে জহরলালকে নিক্রমণে সহায়তা করলেন।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অফিসাররা সুভাষচন্দ্রের বৈঠকের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর শিক্ষাবিদ্‌রা একে একে কক্ষে প্রবেশ করতে লাগলেন। অফিসারবৃন্দ তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিতে লাগলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। তাঁরা একে একে ফুল্ল মনে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন। ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কুদ্‌রত এ খুদা ও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ করলে তিনি বললেন—

: স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বলতেন Man-making is my Principle. অর্থাৎ মানুষ তৈরী করাই আমার উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারতে এ কাজ তিনি শুরু করলেও সংক্ষিপ্ত জীবনে শেষ করে যেতে পারেন নি। আসুন আমরা তাঁর সেই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করি। মানুষ তৈরী করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তবে দেশ গড়া সম্ভব নয়। স্বামীজী আরও বলতেন Manhood, morality, activity, reason and love these I want. তিনি চাইতেন পৌরুষ, নৈতিকশক্তি, কর্মশীলতা, বিচারবুদ্ধি ও ভালবাসা। তিনি পরিষ্কার বলতেন—যার এই সমস্ত গুণ আছে—সে-ই মানুষ।

আপনারা সারা দেশের শিক্ষাচার্যগণ তাই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা

গড়ে তুলুন—যাতে মানুষ যথাপূর্ব স্বার্থপর জীবই থেকে না যায়। স্বার্থপরতা ব্যক্তিবিশেষকে লাভবান করে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত পরার্থপর মানুষ গোটা সমাজকে সারা দেশকে ও দেশবাসীকে লাভবান করে।

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বললেন—

: আমরা বুঝতে পারলাম morality-কে base করে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তবে স্থির করতে হবে শিক্ষার বাহন কি হবে।

সুভাষচন্দ্র বললেন—

: অবশ্যই মাতৃভাষা। যে যে প্রদেশের যে যে মাতৃভাষা সেই সেই ভাষায় তাঁরা প্রবেশিকা পর্যন্ত পঠন-পাঠন চালাবে। তবে আপনারা ভেবে দেখুন যে চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক পরীক্ষার পর অষ্টম শ্রেণীতে Pre-matric course চালু করলে কি রকম হয়? চাষীর ছেলে,ছুতোর কামারের ছেলে, শ্রমিকের ছেলেরা সাধারণ ভাবে এই Pre-matric কোর্স পর্যন্ত পড়ে যদি যে যার বৃত্তিতে চলে যায় তবে জীবন যুদ্ধে সহজে জয়লাভ করবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য যারা এই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পাবে তাদের Matric কোর্স পড়ার সুযোগ করে দিতেই হবে। Matric পর্যন্ত পড়বার পর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজীর উপর জোর দিয়ে আন্ত-প্রাদেশিক বা আন্ত-রাজ্যিক যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখতে চান বা প্রতি রাজ্যে multi-lingual translation secretariate রাখতে চান—তা ভেবে দেখতে হবে। প্রতি রাজ্যের সরকারী কাজকর্ম স্থানীয় ভাষাতেই করতে হবে। ইংরেজ নিজের সুবিধার জন্য এসব ইংরেজীতে করাত কিন্তু এখন দেখতে হবে জনগণের সুবিধা।

জনৈক শিক্ষাবিদ বললেন—

: ইংরাজীর উপর জোর যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তবে আন্ত-র্জাতিক যোগাযোগে কি আমরা পিছিয়ে পড়ব না?

এ প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন—

: আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বেশীর ভাগ দায়িত্ব ত আমাদের ফরেন সার্ভিস-এর উপর থাকবে। যারা ফরেন সার্ভিসে যোগ দেবে তারা ইংরেজী কেন শিখবে না? তা ছাড়া প্রবেশিকা-পূর্ব স্তর থেকে ধরুন নবম শ্রেণী থেকে প্রতি স্কুলের প্রথম ৫ জন মেরিটোরিয়াস ছাত্রকে পড়াবার দায়িত্ব সরকারী ব্যয়ে করাবার কথা ভাবতে হবে। আমি চাই না যে অর্থাভাবে দেশের মেধাবী কোন ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ হোক। পড়াশুনার স্তরটা দু'ভাগে ভাগ করা হোক। এক হল বৃত্তিমূলক স্বল্প-শিক্ষা আর এক হোক শিক্ষামূলক শিক্ষা-কোর্স। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের দিকে ঠেলে দিতে হবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের।

অধ্যক্ষা শ্রীমতী তটিনী দাস জানতে চাইলেন—

: স্ত্রী শিক্ষা ত এ দেশে খুবই পিছিয়ে পড়ে আছে, এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হবে কি?

প্রশ্ন শুনে সুভাষচন্দ্র বললেন—

: অবশ্যই। নারীকে শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতন পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে না। তবে ব্রহ্মচর্য শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে। স্ত্রী-শিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য থাকবে। হোমসাইন্স এ জন্য স্ত্রী শিক্ষায় পাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শীতের দেশ ইউরোপ আমেরিকার দিকে চেয়ে এ দেশে কো-এডুকেশন সিস্টেম চালু করলে চলবে না। কেননা আমাদের সমাজ নারীকে পুরুষের প্রতিযোগী হিসাবে দেখতে চায় না—চায় সহযাত্রি হিসাবে। আমার মনে হয় দেশে "এক আচরণ বাদ" গড়ে তুলতে শিক্ষায় এ বিষয়টা জুড়ে দিতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটা সার্বিক শিক্ষানীতি গড়ে তোলবার স্কীম আপনারা তৈরী করুন। এমন একটা নীতি রচনা করুন যাতে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞান ভিত্তিক চরিত্র শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠে। ইউরোপ আমেরিকার মত ব্যবসায়ীদের স্বার্থের দিকে চেয়ে যদি দেশবাসীকে materialistic gain-এর মোহে মাতিয়ে তোলা হয়

তবে ভারতের সর্বনাশ হবে। Eat drink and be merry—এ নীতি অল্প জনসংখ্যার যান্ত্রিক নির্ভরশীল দেশে চলতে পারে—কিন্তু ভারতের মত অর্থনীতিতে অনুন্নত দু'শ বছরের পরাধীন দেশে চলতে পারে না। স্বামীজী বলতেন—"আসল শিক্ষার অভাবেই আমাদের আজ এত দুর্দশা! যে শিক্ষা মানুষকে জীবন সংগ্রামে জয়ী করে না, যাতে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে না, যাতে চরিত্রের বিকাশ হয় না—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।"

এ কথা মনে রেখে আপনারা শিক্ষানীতি গড়ে তুলুন এবং তাতে নেতৃত্ব দিন। শিক্ষকবৃন্দ মানুষ গড়ার কারিগর হয়ে দেশে পাক উপযুক্ত আচার্যের সম্মান এটাই আমি চাই।

অতঃপর বৈঠকের ব্যবস্থা স্থির করে রাখা হয়েছিল বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে। একে একে উপস্থিত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী ও সারা ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। সুভাষচন্দ্র বললেন—

: বাংলার বেশীর ভাগ সংবাদপত্রই যে একদা গান্ধী-নেহেরু গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং যে জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা আপনারা জানেন। মিথ্যা রটনা ও ঘটনা বিবৃতিতে আপনাদের অনেকে গোয়েবল্‌স্ থিয়োরীকেও হার মানাতে পারেন তা আমরা জানি। কিন্তু এখন থেকে আপনাদের দেশ ও জাতি গঠনমূলক এক অভিনব সাংবাদিকতা শুরু করতে হবে। পলিসি যা হবে তাতে যেন পাঠক উৎসাহিত হয়ে দেশ গঠনের কাজে যার যেমন সাধ্য তৎপর হন—এটা দেখতে হবে। সাংবাদিকতায় কোনরকম নিয়ন্ত্রণ আরোপের অভিরুচি আমার নেই, আমার বা সরকারের জয়ঢাক পিটাতেও আমি আপনাদের বলছি না —কিন্তু মানুষকে উৎসাহিত করার নীতি আপনাদের মেনে চলতে আমি অনুরোধ করব। যে সব কাজ স্বাধীন সরকার জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করবার আগে তার বিরুদ্ধে যে যা যুক্তি খাড়া করতে চায়, তা যেন বিভাগীয়

প্রধানকে জানিয়ে তার মতামত আহ্বান করে। সমাজে, শাসনে যে সব দুর্নীতি ও ঘুঘুর বাসা তৈরী হয়ে আছে তা না ভাঙতে পারলে নতুন ভারত গড়ে তোলা যাবে না। সেই সব কায়েমী স্বার্থের পক্ষে যদি আপনারা কলম ধরেন তবে কঠোর ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন—

: দেশে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের গ্লানি যে মুচেছে এটা যদি সাংবাদিকরা না বোঝে তবে তা দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা সাংবাদিকতাকে জাতিকল্যাণে নিয়োজিত করব—এ আশ্বাস দিতে পারি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন—

: আমরা বুকের রক্তে স্বাধীনতা চেয়েছি এবং সৈনিকদের আত্ম-ত্যাগে নেতাজীর নেতৃত্বে তা পেয়েছি—এটা দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাংবাদিকরা তাদের যথাযথ জাতীয় ভূমিকা পালন করবে—এমন আশা অবশ্যই করা চলে।

যে সকল পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের নামে অপ-প্রচারে লিপ্ত থেকে কবিগুরুর বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন সেই সব পত্রিকার সম্পাদকরা বিশেষ উচ্চবাচ্য করলেন না।

সুভাষচন্দ্র অতঃপর বললেন—

: শুধু মাত্র বড় বড় সংবাদপত্র দিয়েই ভারতের মত বৃহৎ বিচিত্র-রুচির বহু-ভাষিক দেশে জনগণের কাছে নব উপলব্ধি নবীন কর্ম-প্রেরণা পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। তাই গ্রামস্তর থেকে শহর পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ দেখতে চাই। জেলা ও মহকুমা থেকে যে সব ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বরং সেই সব পত্র-পত্রিকা কোন গোষ্ঠী চক্রের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সুষ্ঠু সাংবাদিকতার নজির রাখতে পেরেছে। তাই তাদের এবং বৃহৎ সংবাদপত্রের সমস্যা কি, তার সমাধানে সরকারের কি রকম ভূমিকা গ্রহণ করা উচিৎ এ বিষয়ে আপনারা স্কীম তৈরী

করুন। প্রতি প্রদেশ বা রাজ্যের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি বিকশিত হয়ে উঠে জনগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুক—আমি এটাই দেখতে চাই। বড় বড় সংবাদপত্র সংবাদ ও সংবাদ-ভাষ্যের উপর বেশী গুরুত্ব দিক এবং ছোট ছোট সংবাদ-পত্রগুলি স্ব স্ব অঞ্চলের সমস্যাদি ও তার সমাধানমূলক সাংবাদিকতায় অগ্রসর হোক, এটা দেখতে হবে। নারীজাতির দেশ গঠনে ও সমাজকে সুশৃঙ্খল করার ব্যাপারে যে ভূমিকা আবশ্যক তার অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপকারী কিছু সাময়িক পত্র এবং শিশুদের, কিশোরদের ও যুবকদের চরিত্র গঠনমূলক কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকাও চাই। যে সকল পত্র-পত্রিকা জাতি বিকাশে সহায়তা করবে এবং যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার সুযোগ পাবে না তাদের সরকারী সহায়তা দেবার একটি পরিকল্পনা করা হবে।

এরপর সুভাষচন্দ্র মিলিত হলেন দেশের সাংস্কৃতিক কর্মী ও কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে। এর মধ্যে নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্য-শিল্পী, অভিনয় শিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালকদের প্রতিনিধি স্থানীয়রা হয়েছেন আমন্ত্রিত।

সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের অনেকেই জানালেন আন্তরিক অভিনন্দন। প্রত্যভিবাদন জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন—

ঃ দেশ ও জাতি গঠনে আপনাদের যে বিশেষ ভূমিকা আছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আপনাদের সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি। রস পরিবেশনে আপনাদের যে বিশেষ ভূমিকা তাতে আদিরসের প্রাধান্য না দেখতে পেলেই আমি খুশি হব। মানুষ তৈরী করতে হলে—জাতিকে সিন্সিয়ারিটি, সিরিয়াসনেস এ্যাণ্ড টেনাসিটি এই কটি গুণে হতে হয় গুণান্বিত। আমি চাই না যে আমার জাতি ভাঁড়ামোর দিকে যাক। যুবকদের চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করার মত সৃষ্টিশীলতা আপনাদের দেখাতে হবে। দেশ গঠনে বীণায়

চেয়ে অগ্নিবীণার প্রয়োজন বেশী—এতে জাতি আত্মসচেতন হবে। সংস্কৃতিতে যেন ভারতীয় জাতি সমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে —এটা আমি দেখতে চাই। জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার মত সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র আপনাদের সৃষ্টি করতে হবে। জাতি চরিত্রহীন হোক—হোক আত্ম-বিশ্বাসহীন বিশেষ ধরণের জীব—এ আমি চাই না। সরকার আপনাদের নিয়ন্ত্রিত করতে চায় না—চায় আপনাদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনারা সচেতন—এটা দেখতে। জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার অনু-প্রেরণা প্রকাশিত হোক আপনাদের সৃষ্ট সঙ্গীতে, নৃত্যে, সাহিত্যে অভিনয়ে—এটা নীতি হিসাবে আপনারা গ্রহণ করুন। মানুষের মনের আচরণের পশুতাকে বিদূরিত করে তাতে আরোপ করতে হবে মনুষ্যত্ব। লোভ, লালসা, ভোগবিলাস—এ সব সেই সব দেশে প্রার্থিত হতে পারে—যে সব দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর কিন্তু আমার দেশ দু'শ বছরের পরাধীনতায় নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই হারিয়ে বসে আছে। এই কারণে লুপ্ত বা অপ্রচলিত লোক সাহিত্য, লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য উদ্ধার করতে হবে। আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করেই এক এক জাতির বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়—সে কথা মনে রাখতে হবে আপনাদের। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্র বিদ্যা ধার করব অবশ্যই কিন্তু সংস্কৃতি কিছুতেই নয়। কারণ ওদের পরিবেশে ও আমাদের পরিবেশে আকাশ-পাতাল ফারাক। চলচ্চিত্রকারগণ শুধু মাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে চলচ্চিত্র নির্মাণ করুক—এটা চাই না, সেই সঙ্গে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও চাই। এগুলি স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখানো হবে এবং এমন চিত্র তুলতে শিক্ষাবিভাগ থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হবে।

এই ভাবে সুভাষচন্দ্র শেষ করলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর দিল্লী বেতার কেন্দ্র দখলের পর দেখতে দেখতে কেটে যায় একটি মাস। নেতাজীর দশটি নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলা হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে অতঃপর স্বাধীন সরকারের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট এবং রাজ্যিক সেক্রেটারিয়েট সমূহের দায়িত্বশীল অফিসারবৃন্দ এবং আজাদ হিন্দ সিক্রেট সার্ভিসের দুর্দ্ধর্ষ অফিসারদের সঙ্গে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে রাষ্ট্রপতি ভবনের সেন্ট্রাল হল-এ।

সুভাষচন্দ্র সামনের টেবিলে রক্ষিত কাগজের দিকে চেয়ে বললেন—

: আমার ১ নম্বর নির্দেশ ছিল—বেসামরিক বৃটিশ নাগরিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে কোন রকম বাধা দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে কিরূপ কি করা হয়েছে, সকল বৃটিশ নাগরিক স্বদেশে ফিরে গিয়েছে কিনা অথবা কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে কিনা বলুন—

জনৈক অফিসার বলেন—

: সারা দেশে হাজারের মত বৃটিশ ব্যবসায়ী ছাড়া আর সকলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তম করেছে। কোন কোন স্থানে জনগণের পক্ষ হতে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ সে সব প্রতিরোধ করেছে। বৃটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিষয়ে ব্যবসায়ীরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়।

সুভাষচন্দ্র বলেন—

: জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এদের প্রসঙ্গে সেন্ট্রাল সেক্রে-টারিয়েটের ফরেন সেল-এর অফিসাররা আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবস্থা নিন।

আমাদের ২ নম্বর ঘোষণায় নির্দেশ ছিল—সিভিল এ্যাডমিনি-স্ট্রেশন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে চলতে থাকবে। এ ব্যাপারে কি কোন স্থানে সমস্যা দেখা দেয় ?

: সারা দেশে প্রো-বৃটিশার এবং বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন কিছু অফিসার আই. এন. এ. সিক্রেট সার্ভিসের

নেতাজীর পাণ্ডা প্রদর্শনকারী অফিসারদের নির্দেশ মেনে না চলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল জানালেন নেতাজীকে। সুভাষচন্দ্র অতঃপর বললেন—

: ঠিক আছে। ৩ নং ঘোষণায় পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে নির্দেশ ছিল। এতে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে কি?

: না স্যার।

পুলিশ প্রশাসনের সেন্ট্রাল হোম সেক্রেটারিয়েটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন।

: ৪ নং ঘোষণায় বলা হয়েছিল — ইনটালিজেন্স সম্পর্কে। রেকর্ডগুলি সীল করে সংরক্ষিত হয়েছে কি?

জানতে চান সুভাষচন্দ্র। ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন—

: কোন কোন স্থানে রেকর্ড পাচার করার প্রচেষ্টা হয়েছিল— তবে সেই সেই স্থানের বিশ্বস্ত কর্মচারীরাই তা যথাবিহিত প্রতিরোধ করেছে।

: ৫ নম্বর নির্দেশে ঘোষণা করা হয়েছিল আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর ছাপ সকল বৃটিশ ভারতীয় রুপী কারেন্সীতে মেরে দেওয়া হবে।

বললেন সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক-এর গভর্ণর বলেন—

: নোটগুলিতে ছাপ মেরে স্মল কয়েন জমা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মিণ্টগুলোতে স্মল কয়েন তৈরী করে তা রিপ্লেস করা শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই আমাদের নোটগুলি ছেপে বেরিয়ে আসবে নাসিক-এর নোট ছাপাই প্রেস থেকে। তখন বৃটিশ ভারতীয় নোটগুলি বাতিল করে এই নতুন নোট সাড়া দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ডাক টিকিটেও স্বাধীন সরকারের ছাপ মারা হয়েছে বলে পোস্টাল ডিরেক্টরেট জানিয়েছে।

সুভাষচন্দ্র অফিসার মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন—

: ৬ নম্বর নির্দেশে বলা হয়েছিল আগামী সাত দিনের মধ্যে সকল ১০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার নোট আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে

যথাযথ রসিদ নিতে হবে।—এ নির্দেশ সমগ্র দেশে পালন করা হয়েছে কি ?

সেনট্রাল সেক্রেটরিয়েটের সেক্রেটারী জেনারেল জানালেন—

ঃ স্যার, এই ঘোষণা দেশের সর্বত্র কার্যকরী হলেও এক শ্রেণীর কালোবাজারি, খাদ্যে ভেজালদানকারী এবং সীমান্তের চোরাই চালানদার এবং বোম্বাই বন্দর সংলগ্ন চোরাই সোনা আমদানিকারীরা তা লঙ্ঘন করে। ব্যবসায়ীরা শেয়ার-মার্কেটে নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে বৃটিশ-ভারতীয় ঐ অঙ্কের নোটগুলি পরস্পর আদান-প্রদান করতে থাকে। এদের উদ্দেশ্য যুদ্ধকালীন ফাঁপাই অর্থনীতির সুযোগে এরা কত কালো টাকা মজুদ করেছে সেটা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রাখা।

ঃ এরূপ লঙ্ঘনকারীর সংখ্যা কত ? —জানতে চান সুভাষচন্দ্র।

ঃ স্যার, আমাদের সিক্রেট সার্ভিসের অফিসাররা সারা দেশে জাল পেতে এমন এক হাজার জনকে গ্রেফতার করেছে এবং সেই সংগে পঞ্চান্ন কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচ শত টাকাও আটক করেছে। এখন, এদের কিরূপ শাস্তি দেওয়া হবে, সে বিষয়ে আপনার নির্দেশ বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ চেয়েছে।

সুভাষচন্দ্র বললেন—

ঃ এদের সঙ্গে ইংরেজের এজেন্ট রাজনৈতিক কোন গোষ্ঠীর গোপন আঁতাত আছে কি ?

সেক্রেটারী জেনারেল জানালেন—

ঃ এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কোন তথ্য আমার কাছে নেই। যদি আদেশ করেন তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ইনভেষ্টিগেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

ঃ হ্যাঁ, আমি বলছি স্বাধীন সরকারের আদেশ অমান্যকারী কালোবাজারী, ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ী এবং স্মাগলারদের exemplary punishment দিতে চাই যাতে আগামী দশ বছরে দেশে এ ধরণের কাজ না করা হয়। তবে হ্যাঁ, এই কাজের যারা বাস্তুঘুঘু

বেছে বেছে মাত্র সেই কয়েকজনকে ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে গুলি করে হত্যা করা হবে আর এদের এই প্রতারণা অর্জিত সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

: সেইভাবেই স্যার এদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

—বললেন সেক্রেটারি জেনারেল। তাঁর কথা শেষ হতে সুভাষচন্দ্র বললেন—

: ৭ নম্বর নির্দেশ সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দেয় নি ত' ?

: না স্যার, যে সব মাইনর প্রবলেম এ্যারাইজ করেছিল তা কাস্টমস্ অথরিটি মোকাবিলা করেছে। আপনার বাদবাকি নির্দেশ-গুলির মধ্যে ৮ নম্বর নির্দেশ প্রায় সব রাজনৈতিক দলই মেনে নিয়ে political activity বন্ধ রেখেছে। ৯ নম্বর নির্দেশানুসারে শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন। ১০ নম্বর নির্দেশ সকল ধর্মীয় নেতারা মেনে চলছেন।

: তা হলে দেখা যাচ্ছে ৬ নম্বর নির্দেশই এখন আমাদের headache.

বললেন সুভাষচন্দ্র। সেক্রেটারী জেনারেল বললেন—

: Capital punishment দিলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

: বেশ ত' আপনারা সিনিয়র অফিসাররা Capital punishment দেবার পক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য পয়েন্ট লিখে আমার কাছে দিন। সে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমার মনে হয় জাতির সার্বিক কল্যাণের বিরোধী লোভ ও লালসার দ্বারা যারা ধন বৃদ্ধি করে তাদের শায়েস্তা করতে না পারলে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

সুভাষচন্দ্রের এই নবভারত গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করবার শেষ বৈঠকে ডাকা হল দেশের সেই পাঁচ শত জন ক্যাপিটালিস্টকে যারা মূলত ব্যবসা জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে।

টাটা, বিড়লা বাজোড়িয়া হতে সব প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা এল। এদের অনেকেই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেও বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখ দেখা গেল থমথমে। আগামী দিনের অর্থনৈতিক রূপরেখা সম্পর্কে এদের মনে নানা সন্দেহ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

সুভাষচন্দ্র বললেন—

ঃ আপনারা ধনিক সম্প্রদায় নতুন ভারত গঠনে কি ভূমিকা নিতে চান তার একটা পরিকল্পনা রচনা করুন। মানুষকে বঞ্চিত করে যখের ধন সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে সরকার সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবে। আমাদের দেখতে হবে সব রকম ব্যবসা ও কলকারখানা যেন বৃহত্তর জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। এতদিন ইংরেজ সরকার চরিত্রগত ভাবে নিজেও ছিল শোষক আপনাদেরও শোষণের তাই সুযোগ দিয়ে এসেছে ; কিন্তু এখন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সরকার আটত্রিশ কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর ভাত বা রুটি ও কাপড়ের ব্যবস্থা করার প্রয়াসী। ধন যদি আপনাদের মত মাত্র শ' পাঁচেক ক্যাপিটালিস্ট-এর কুক্ষিগত থাকে তবে ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তা ব্যয়িত হতে পারে না। তাই এমন স্কীম রচনা করুন যাতে আপনারা নব ভারত গঠনে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। ইওরোপ নয়, জাপানের দিকে তাকান। এশিয়ায় জাপানই একমাত্র রাষ্ট্র যে জনগণের আয়ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে পেরেছে। ১০০ এবং ১০০০ টাকার নোট সরকারে জমা নিয়ে এবং স্বাধীন সরকারের কারেন্সীর নব পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা দেশে যুদ্ধের ফাঁপানো অর্থনীতিতে কত কালোটাকা সঞ্চিত হয়েছিল তার মোটামুটি একটা হিসাব করতে পেরেছি। এখন আমাদের ন্যাশনাল ইকনমি গড়ে তুলতে আপনাদের প্রস্তাব যত শীঘ্র সম্ভব আহ্বান করছি। সরকার ন্যাশনালিস্ট বুর্জোয়াদের সঙ্গে ততক্ষণই সহযোগিতা করবে যতক্ষণ তারা বৃহত্তর জনমণ্ডলী ও শ্রমিকস্বার্থ লাঞ্ছিত না করে। তবে আমরা দেখতে চাই প্রায় সব প্রদেশেই কোন না কোন শিল্প গড়ে

উঠুক। বড় বড় কলকারখানার প্রচারভ্যালু থাকতে পারে কিন্তু তা man power-এ অনুন্নত এ দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। এছাড়া ইওরোপ, আমেরিকার মত আমরা মানুষের মনে ফ্যাসানের ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা ঢোকাতে চাই না। বর্তমানে দশ বছর পোষাক ও প্রসাধন দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে প্রয়োজন ভিত্তিক। বস্ত্র উৎপাদনেও সেই নীতি চাই। জোর দিন আপনারা খাদ্যশস্য উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করায়। গৃহে গৃহে বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং বস্তু সামগ্রী উৎপাদনের অংশ বিশেষ তৈরীর ছোট ছোট যন্ত্র ছড়িয়ে দিন। সেগুলো সংগ্রহ করে এসেম্বলিঙ-এর জন্য মাঝারি কারখানা গড়ুন। লক্ষ্য রাখুন যাতে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারী দুর হয়, মানুষ পেট পুরে দুটো রুটি বা ভাত পায়। দরিদ্রের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে ধনিকগোষ্ঠী বুইক বা ডি-সোটো হাঁকিয়ে যায় এটা আমি সহ্য করব না।

অবশেষে এগিয়ে এলো ফায়ারিং স্কোয়াডে দেশের সেই কুখ্যাত কালোবাজারীদের শাস্তি দেবার দিন। সমগ্র দেশে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে দু'জন পাঁচ জন বা দশ জন কালোবাজারী, ভেজাল কারবারী ও স্মাগলারকে ইংরেজের এজেন্ট হিসাবে স্বাধীনতার শত্রু রূপে চিহ্নিত করে বিশেষ বিচারালয়ে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। তাদের আরও অপরাধ ইংরেজের কারেন্সী চালু রেখে আয় ও অর্থ সম্পদ গোপন রেখে স্বাধীন সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রায় সব প্রদেশে ধিক্কার দেবার ব্যবস্থা হল। ঘোষণা হল যে জনসাধারণের উপস্থিতিতে একই সময়ে সব অপরাধীকে সেনাবাহিনীর লোকেরা গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

এই শাস্তির কথা ঘোষণা করার পর আরও সাত দিন সময় দেওয়া হল ১০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যের বৃটিশ-ভারতীয় কারেন্সী জমা দেবার। দেখা গেল এই ঘোষণায় কোটি কোটি টাকার গোপন নোট

সরকারে প্রকাশ করা হতে লাগল প্রাণদণ্ডের আতঙ্কে।

সমগ্র দেশের রাজধানী শহরগুলিতে বিশেষ মঞ্চ করা হল ফায়ারিং স্কোয়াডের জন্য। যথা নির্দিষ্ট দিনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রে-টের উপস্থিতিতে ব্যবস্থা হল মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকরি করবার। উৎসাহে উদ্দীপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীন সরকারের সেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগের দৃশ্য দেখতে হল সমবেত।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ মত প্রিজন ভ্যানে করে কালো কাপড়ের টুপিতে মস্তক আবৃত্ত হাত-পা বাঁধা বন্দীদের নিয়ে আসা হল যথা নির্দিষ্ট মঞ্চে। কালো রঙের লৌহ দণ্ডের সঙ্গে তাদের বেঁধে দেওয়া হল সার বেঁধে। গুলি করার ভারপ্রাপ্ত সৈনিকরা হাতে হাতে রাইফেল নিয়ে যথাস্থানে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালো। ম্যাজিষ্ট্রেট তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখলেন কব্জির ঘড়ির কাঁটার দিকে। টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে চলতে লাগল মিনিটগুলিকে মূল্যায়িত করতে।

অবশেষে ১টা বাজার এক মিনিট আগে ম্যাজিষ্ট্রেট মাইক যোগে সৈনিকদের অ্যালার্ট হতে হুকুম দিলেন। সেই রুদ্ধশ্বাস মুহুর্তগুলি কেটে যেতে লাগল। মিনিটের কাঁটা ১২টার ঘরে এবং ঘণ্টার কাঁটা ১টার ঘর স্পর্শ করামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট হাতে ধরা টয় রিভালবারের ট্রিগার টিপলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের হাতে ধরা রাইফেল গর্জে উঠতেই গরম গুলি ছুটে গিয়ে অপরাধীদের বক্ষ বিদীর্ণ করল।......

যেন গর্জিত রাইফেলের গুলি বর্ষণের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যপ্রকাশের। পড়ার টেবিল থেকে মাথা তুলতে দেখলেন ঠিক পাশটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সহধর্মিনী হেমলতা দেবী। নির্মল রৌদ্রে ঘর ভরে গেছে।

বিভোর ভাবটা কেটে যেতে তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে কেমন ঘোরলাগা গভীর স্বরে বললেন—

: তবে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম! কিন্তু কী গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থিত স্বপ্ন!

: কেউ ব্রেকফাস্ট ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল যে, তুমি এইভাবে ঘুমুচ্ছ রাইটিং টেব্‌লে। ভাবলাম অসুখ-বিসুখ করল নাকি, তাই ছুটে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। কোন দুঃস্বপ্ন দেখছিলে কি?

: দুঃস্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন কি বলছ! এমন সুন্দর স্বপ্ন কে কবে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে বল?

ডঃ সত্যপ্রকাশ শুনতে পেলেন পাশের ঘরের রেডিওতে তখন সুরেলা কণ্ঠে কোন সঙ্গীত শিল্পী গাইছিলেন—

স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা.........
আমায় জাগিও না—জাগিও না.....

কিন্তু ডক্টর সত্যপ্রকাশ যে জেগে গেলেন! একটা বিরক্তিকর আক্ষেপ উথলে উঠল যেন ডক্টর সত্যপ্রকাশের হৃদয়ের নিভৃত প্রকোষ্ঠে।

—০—